৩৫ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		২
আহরণ	কপিল ভট্টাচার্য	৩
অসংগঠিত মানুষের লড়াই	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৮
কালবুর্গি খুন	পূরবী ঘোষ	১১
কৃষ্ণ মোটেই ভগবান নন		১২
নিলয় নিছক ব্লগার নন	বিবর্তন ভট্টাচার্য	১৩
রাজনীতি ও কাজী নজরুল	সুজাতা সেনগুপ্ত	১৪
নুডল্‌স বিষ	অরুণ পাল	২০
সন্তান প্রতিপালন ছুটি	ইমনকল্যাণ জানা	২২
লাভের গুড় কে খায়	বরুণ ভট্টাচার্য	২৮
বাঁচান হল জলাভূমি	বিবর্তন ভট্টাচার্য	২৯
স্মৃতিচারণ সভা		৩০

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/

৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

জঞ্জাল

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

এ মনে জমেছে বিস্তর জঞ্জাল,
অসংখ্য পোকা থিকথিক শ্লথগতি।
কাছেই ফুটেছে নানান রঙের ফুল;
ওড়ে চারপাশে রঙ্গিলা প্রজাপতি।

বাড়ির ময়লা বড় সমস্যা নয়।
ফেলা হোক একে যত্নে যথাস্থানে।
মনে জঞ্জাল জমলে ঘোর বিপদ;
এই ময়লার গতি হবে কোনখানে?

দুঃখের স্মৃতি নয় তো আবর্জনা।
না হয় হলাম বিফল পরীক্ষায়।
দুঃখ কখনো অসহ্য মনে হলে
চোখের জলেই খানিকটা ধুয়ে যায়।

আসল বিপদ মনের আবর্জনায়।
চিন্তার পথ জুড়ে থাকে চাপ চাপ।
কিছু মলিনতা ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষমা;
কখনো পোড়ায় সুতীব্র অনুতাপ।

কিছু মানুষ তো সত্যি ঈর্ষণীয়,
কতো সহজেই পেয়ে যায় প্রতিকার।
চোখ বুজে শুধু বলে 'নির্মল করো'
কাজে লেগে যায় ঈশ্বর ঝাড়ুদার।

আমার জীবনে টের পাইনি তো তাকে।
থাকলেও তাকে ডাকার ইচ্ছে নেই।
নিজের ঝামেলা নিজে সামলানো ভালো।
তাই তো এখনো শান দি' যুক্তিকেই।

আমাদের কথা

মুক্তচিন্তকরা খুন হচ্ছেন, আমরা নির্বিকার

'নিজে ধর্মাচারণ না করো ক্ষতি নেই, অন্যকে উস্কাতে যেও না, মুক্তচিন্তার কথা প্রচার কোর না।' যারা চোরার মতো ধর্মের কাহিনীতে কান দিচ্ছেন না, তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দিতে নেমে পড়েছে ধর্মধ্বজীরা। দূর আরব, সিরিয়ায় মুণ্ডচ্ছেদ চলছে। পিছিয়ে নেই আমাদের সোনার বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক শিকার নিলয় চক্রবর্তী। ঢাকায় ওঁর বাড়িতে ঢুকেই শিক্ষা দিয়ে এসেছে। প্রতিবেশী দেশের 'ধর্মশিক্ষা' এদেশেও পৌঁছেছে। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা, যুক্তিবাদের প্রসারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন কর্ণাটকের এম এম কালবুর্গি। নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারের মতো তাঁকেও নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হল। বছর ঘুরতে চলল সরকার খুনিদের টিকিটিও ছুঁতে পারে নি। বোঝাই যায়, কালবার্গির খুনিরাও বহাল তবিয়তে থাকবেন। যারা ভাবছি, এটা পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র বা কর্ণাটক নয়, ভুল করছি। এখানেও ধর্মপ্রাণ বা প্রাণাদের অভাব নেই। গোটা বিশ্ব থেকেই মার্কসবাদ মুছে গিয়েছে। আত্মোন্নতি ছাড়া সামনে আদর্শ বলতে কিছুই নেই। বিপ্লব বলতে ভোট দিয়ে রামের জায়গায় শ্যামকে আনা। সেই টুইডেলডাম আর টুইডেলডি- র গল্প। যেটুকু পড়ে থাকে, তা ধর্ম। যেখানে বড় গাছ নেই, সেখানে এরেন্ডা গাছকে মহীরুহ বলা হয়। ফাঁকা মাঠে ধর্ম যে ছড়ি ঘোরাবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে! আমাদের মার্কসবাদীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারকাছ দিয়ে যাননি। উল্টে 'জল ও মাছ' তত্ত্ব আওড়ে দুর্গাপুজো কমিটিতে ঢুকে পড়েছেন। পাড়ার মোড়ে প্যান্ডেল খাটিয়ে কয়েকটা মার্কসীয় সাহিত্যের বই নিয়ে বিক্রির মধ্যে তাঁদের যাবতীয় বিপ্লব সীমাবদ্ধ। পুজোর নামে শুরু হয়েছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কেউ প্রতিমা বানাচ্ছে দানবীর মাপের, কেউ শিল্পের হদ্দমুদ্দ করছে। সবার দাবি, তারাই সেরা। মুক্তকচ্ছ হয়ে দর্শকরা এসো। তিন দিনের পুজো আগু-পিছু নিয়ে ১৫ দিনের। ময়দানের বারপুজোর অনুকরণে খুঁটিপুজো নামে নতুন রঙ্গ চালু হয়েছে। মন্ত্রী, নেতা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ফুলবেষ্টিত বংশদণ্ড ছুঁয়ে বত্রিশ পাটি বিকশিত করে ছবি তুলছেন। ছাপা হচ্ছে। রাস্তা জুড়ে বীরদর্পে বাঁধা হচ্ছে মণ্ডপ। নতুন নতুন পুজোর আবদার শুরু হয়েছে। অনুমতি না মিললেই আদালত। আদালত ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ অনুমোদন করছে না। এবার চোর-ডাকা, ধর্ষকরাও দুর্গাপুজোর আবদার জানাল বলে। সত্যিই তো, মা কি কারও একার! মহারাষ্ট্র থেকে গণপতি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, চন্দননগর থেকে জগদ্ধাত্রী। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা নয়, পুজো দিয়ে দেশ ঘেরা চলছে। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে কালবুর্গি হয়ে যেতে হবে।

'নার্সের গাফিলতি, আঙুল হারাল শিশু' শিরোনামে সম্প্রতি একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বালুরঘাট হাসপাতালে মোবাইলে কথা বলতে বলতে এক নার্স আন্ত্রিকে আক্রান্ত শিশুর আঙুল থেকে স্যালাইনের ছুঁচ বের করতে গিয়ে আঙুলটাই কেটে ফেলেন। তাই নিয়ে কিঞ্চিৎ শোরগোল হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মমাফিক বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। এদিকে অন্য নার্স এবং কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন, ওই নার্সের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। সঙ্গত আন্দোলন। এরপর ওঁরাও নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে কত কি কাটবেন, কতজনকে মারবেন, তাহলে তো সবাইকেই শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া যে ভদ্রলোকের ছেলের আঙুল কাটা গিয়েছে, সেই বাবলা মণ্ডল কোনও গণ্যমান্য বা হোমরাচোমরা হলে কথা ছিল, এক হার্ডঅয়্যারের দোকানের সামান্য কর্মী। সেই নীতিগল্পটা মনে করুন, বাঘের গলায় আটকে থাকা হাড় বের করে দিয়ে বক পুরস্কার চেয়েছিল, বাঘ বলেছিল, আমার মুখের ভেতর থেকে মাথা বের করে নিতে পেরেছিস, এর চেয়ে আর বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! এই ডাক্তার, নার্সরাও পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে বলতে পারেন, আমাদের হাতে ছেলের সামান্য একটা আঙুল কাটা গিয়েছে, প্রাণ নিয়ে তো ফিরছে, এটাই তো বড় কথা।

ছোট্ট খবর: নানা পাটেকারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। ১৮০টি পরিবারকে ৯০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমাদের খেলোয়াড়, সেলিব্রিটিরা ওদিকে নেই। এক ক্রীড়া আইকন আয়লায় ৫০ লাখ দেবেন বলেও দেন নি। ঠিক করেছেন, ওই টাকায় আরও একটা ভাল গাড়ি হয়ে যায়। টাকা বোকারাই বিলোয়!

উমা

আহরণ

ক্ষমতায় আসতেই পক্ষের লোক বিপক্ষে!

কপিল ভট্টাচার্য

কপিল ভট্টাচার্যকে কজনই বা মনে রেখেছেন! প্রযুক্তিবিদ, নদীবিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক এই মানুষটি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি) পরিকল্পনা স্তরে এর ভুলত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সরব হয়েছিলেন। এমনকি সভাসমিতি করে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ওঁর কথা কেউ শোনে নি। একসময় যাঁরা ওঁর পাশে ছিলেন ক্ষমতায় আসার পর তাঁরাও ডিগবাজি খান। আজও এ রাজ্যের বহু জেলা ডিভিসি-র বাঁধের জল ছাড়লে ভেসে যায়। মানুষের ক্ষোভ প্রতিবাদের দিশা পায় না। রাজনৈতিক দলগুলো ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করে, পরস্পরকে দোষারোপ করে আর পরের বছরের বন্যার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন বানভাসি মানুষ। প্রযুক্তিবিদের সাবধানবাণীকে উপেক্ষা করার মতো মূর্খামির ধারাবাহিকতা আজও চলছে। কপিল ভট্টাচার্যের দূরদৃষ্টি কতটা ছিল, আজও তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক তা ওঁর সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যাবে।

প্র : ১৯৭৮ সালে কলকাতা শহরের উপর যে ব্যাপক বীভৎস বন্যা হয়ে গেল, গত একশ বছরে সেরকম দেখা যায় নি। এর কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?

উ : দেখুন বৃষ্টির জলে ডোবা কলকাতার প্রধান সমস্যা তার ভাল জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাব। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ, এইসব অঞ্চলের জলনিকাশ প্রণালী হচ্ছে হুগলি নদী। ইদানীং হুগলি নদীর মোহানায় অনেক চর পড়ে গিয়ে ওটার জলনিকাশী ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। তাহলে সেইটাই দেখবেন উপচে পড়ে বন্যারূপে দেখা দিল। আগে তবু কলকাতা সংলগ্ন নীচু জমিগুলো শহর থেকে নিষ্কাশিত জলের জলাধারের কাজ করত। আজ সে সবের উন্নয়ন হয়েছে। প্রচুর লোকজন থাকে সেখানে। লবণহ্রদ আজ বিধাননগরী হয়েছে।

প্র : কলকাতার আশেপাশে যে খালগুলো রয়েছে, যেমন বাগজোলা খাল, এগুলোর মাধ্যমে তো কলকাতায় যে জল জমে তা বেরিয়ে যায়। তো সেগুলো?

উ : সেগুলো এখন আর ভাল করে কাজ করছে না, সব মজে গেছে। বাগজোলা, বিদ্যাধরী খাল— গেলেই দেখতে পাবেন মজে গেছে।

প্র : আপনি কী বলছেন হুগলি নদীর মজে যাওয়া আর বিদ্যাধরী, বাগজোলা মজে যাওয়ার কারণ একই?

উ : একদম এক। আগেও মজে যেত, তারপর কাটা হয়েছিল কিছু কিছু। আজকাল আর সেইসব হয় না। যতক্ষণ জোয়ার আসবে, জোয়ারের সাথে পলি আসবে, ততক্ষণ এগুলো প্রতিরোধ করা শক্ত। মোহানার ১৫ মাইল চওড়া মুখ দিয়ে গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ কিউসেক জোয়ারের জলের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের উপকূল মঞ্চ থেকে নিয়ে আসা বিপুল পরিমাণ পলিমাটি রোজ নদীগর্ভ ভরাট করে চলেছে। আগেও ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণ কলকাতাকে বহুবার সহ্য করতে হয়েছে। বৃষ্টির জলে কলকাতা ডুবেছে কিন্তু নদীর প্লাবন কলকাতায় সহজে ঢুকতে পারে নি। কলকাতার চারদিকেই উঁচু বাঁধ যে! পশ্চিমে স্ট্রান্ড রোডের বাঁধ, পূর্বে রেলের বাধা, কিন্তু আজকাল বর্ষাকালে হুগলি নদীর বানের জল খেলার মাঠগুলোকে হাঁটুজলে ডোবাচ্ছে। আর আটাত্তরের বর্ষাকালে চৌরঙ্গী ডুবেছে, রবীন্দ্রসদনে জোয়ারের জল ঢুকেছে। ভাগীরথী, হুগলি, রূপনারায়ণের খাত মজে যাচ্ছে, চরগুলো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছে। তাই জোয়ারের উচ্চতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পঞ্চাশের দশকের আগে যেখানে বছরে ২০-২২ দিন বান ডাকত আজ সেখানে ১৮০ দিনের ওপর বান ডাকে।

কিন্তু হুগলি নদী ততটা মজে নি। যতদিন হুগলি নদীতে ফ্লাশিং ওয়াটার ছিল। ডিভিসি-র বন্যানিরোধী পাঞ্চেত ও মাইথনের বাঁধ দুটো তৈরি হবার পর থেকেই হুগলি নদীতে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আগে মে, জুন, জুলাই মাসে

দামোদরের ছোট ছোট বন্যাগুলো প্রবাহের ভরবেগের সাহায্যে মোহানার খাতের চর কেটে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিত। ডি ভি সি-র ড্যাম যখন করা হল তখন আমি বললাম, এই যে ফ্লাশিং ওয়াটার নিয়ে নিচ্ছ এতে হুগলি নদী মজে যাবে এবং বন্যা হবে এ নদীর মধ্যে। এতে অনেক অসুবিধে। আমার কথাটা কর্তৃপক্ষ পরোক্ষে স্বীকার করল, বলল ফরাক্কা ব্যারাজ করে ফ্লাশিং ওয়াটার দেব হুগলি নদীর ওপর। আমি বললাম, তোমরা যে ফ্লাশিং ওয়াটার দেবে, প্রথম কথা ২০, ০০০ কিউসেক দেবে, এতে কোনো কাজ হবে না; দ্বিতীয়ত, হুগলি নদী ডায়মন্ডহারবার গেঁয়োখালির কাছে রূপনারায়ণের উপর লম্বভাবে পড়েছে। তাই ভাগীরথী-হুগলির জল নিম্ন হুগলিতে সমকোণ গতিতে ঘুরে তার ভরবেগ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে, বিশেষত ওই সঙ্গমের পরেই নদীর বিপুল বিস্তৃতির জন্য। আমাদের সমর্থন করে আরো অনেক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এ বিষয়ে মত দিলেন। তাতে ওরা শেষকালে বলল ৪০,০০০ কিউসেক জলে কাজ হবে। ওরা সংযুক্ত জাতিপুঞ্জ থেকে বিশেষজ্ঞ আনালেন ডঃ হ্যানসেন বলে একজনকে। তিনি বলেন, ৪০,০০০ কিউসেক-এর কম জল দিলে কাজ হবে না। কিন্তু একটা কথা লেগে গেল বাজে, যে ৪০,০০০ কিউসেক জল আদপেই নেই— বিশেষ করে শুখা মরসুমে গঙ্গায়-পদ্মায়। সে কথাটা জনগণের কাছে চেপে গিয়ে ওরা ফরাক্কা ব্যারাজটা করলেন। আমি অবশ্য বললাম, ৪০,০০০ কিউসেক জল আনতে পারলেও হবে না। যে ফোর্সটা দামোদরের বন্যা রূপনারায়ণ নদী দিয়ে জল সরবরাহ করত, নদীটার আনতি (gradient) অনেক খাড়া বলে তার যে জোর হত, ভরবেগ এত বেশি হত, সে জোর হবে না হুগলি নদীতে গঙ্গা থেকে জল আনলে। কারণ অনেক; এতদূর থেকে আনতে হবে; ভাগীরথীর ঢাল মাত্র ৩ ইঞ্চি/মাইল আর ১ ফুট/ মাইল-এর ওপর হচ্ছে রূপনারায়ণের ঢাল। কাজেই ওভাবে করলে হবে না। দামোদর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তো আমার একটাই সমালোচনা ছিল যে ফ্লাশিং ওয়াটার-টা নিলে হুগলি নদীটার ক্ষতি হবে। হুগলি নদীটাই যখন জলনিকাশের প্রধান প্রণালী— তার অবনতি হলে, ক্ষতি হলে, জলনিকাশ সহজে হবে না। বন্যা বাড়বে।

তাছাড়া এটাও আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম; রুক্ষ ভাষায়, খারাপ ভাষায় এসব কথা বললাম— তোমাদের জল নেই অথচ জল দেব বলছ? এ মিথ্যাচার করার কী দরকার? কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী এস কে পাতিল, গুলজারিলাল নন্দ, তাঁরাও আমার সাথে একমত হল। তাঁরা ফরাক্কা ব্যারাজ করতে চান নি, অনেক দেরি করেছিলেন। কিন্তু এখানকার অতুল্য ঘোষ ও অন্যান্য কংগ্রেসি নেতারা— তাঁরা বিশেষ করে উঠে পড়ে লাগলেন।

প্র : কিন্তু কেন? কেন এই সত্যকে চেপে যাওয়া ...?

উ : ব্যাপার হল, ইতিমধ্যে মোকামায় গঙ্গার পুল হল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি বিহারে পুলটা করে দিলেন। এদিকে বিধান রায় তখন দেখলেন যে পারা যায় না। তিনি বুদ্ধি করলেন, আমাদের এখানে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার সোজা রাস্তা নেই, এখানে আর ব্রিজ করতে দেবে না, সুতরাং উনিও তদ্বির করলেন যাতে ফরাক্কা ব্যারাজটা করা যায়। তাতে ওপর দিয়ে পুলও হবে আর এদিকে কাজও হবে।

প্র : কিন্তু এর যে ভয়াবহ ফল?

উ : ভয়াবহ ফলটা তো সাধারণ মানুষ বোঝে না, জনগণ তো এত গভীরে যায় না। আমি যেটুকু বলেছি খুব কম সংখ্যক কাগজে অনেক কষ্টে আমারটা ছাপে। দু-একটা বামপন্থী কাগজ— 'স্বাধীনতা', এসব কাগজ আমার লেখা ছেপেছিল। অনেক চেষ্টা করেছিলাম স্টেটসম্যান যাতে আমার লেখা ছাপে। ভাল করে বক্তব্যটা প্রকাশই হতে দিল না। এ বিষয়ে বইও লিখলাম। যারা পড়ল তারা কিছু কিছু বুঝল। কিন্তু খুব একটা জনমত গড়ে উঠল না।

প্র : কিন্তু বিধান রায় কি ভয়াবহ ফলটা না বুঝেই এসব করলেন? নাকি তারও কোনো স্বার্থ ছিল?

উ : স্বার্থ কিছুই ছিল না। আমি ভালভাবে বিবেচনা করেই বলছি। আমার সাথে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতাও ছিল, ভালও বাসতেন আমাকে। কিন্তু অন্যান্য সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা যাঁরা এসব পরিকল্পনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা যদি একটা মত দেন তাহলে উনি কী বলবেন? উনি তো আর ইঞ্জিনিয়ার নন।

প্র : কিন্তু সরকারি ইঞ্জিনিয়াররাই বা এরকম বললেন কেন?

উ : খানিকটা গোঁয়ার্তুমি, আত্মসম্মানের ব্যাপার এবং জেদ। যেমন আমারই এক বিশিষ্ট বন্ধু তদানীন্তন রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর এন কে বোস বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, হ্যাঁ ক্ষতি একটা হবে, কি কাজ করলে ক্ষতি না হয় পরে শুধরে নেওয়া যাবে। আমি বললাম ডিভিসি করতে আপত্তি করছি না কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে ওর জলটাকে ফ্লাশিং ওয়াটার হিসাবে ব্যবহার কর, জলসেচের পরিকল্পনাটা খুলো না। কিন্তু জলসেচ না করলে জনপ্রিয়তা হয় না। তাই ওরা জলসেচের পরিকল্পনাটা করল। পরিকল্পনাটা বড় করে করেছিল, কার্যত কম করে প্রয়োগ করল।

প্র : আপনি ১৯৬১ সালে যে বইটা লিখেছেন— 'সিলটিং অব ক্যালকাটা পোর্ট'— তাতে তো বলেছিলেনই, ফরাক্কা পরিকল্পনা বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এটা লিখে সরকারকে সতর্ক করে দেন। এবং আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি ঐ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলার অগুনতি মানুষের দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬১ সালে সেসব কথা বলার জন্য তো আপনাকে অনেক মাসুলও দিতে হয়েছিল বলে শুনেছি। কিরকম ব্যাপারগুলো ঘটেছিল?

উ : ওরা আমাকে থামাবার নানারকম চেষ্টা করেছিল। আমি তখন একটা জাহাজ নির্মাণ কারখানার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। এখানকার অজয় মুখার্জীর মতো লোকেরা কোম্পানির ডিরেক্টদের কাছে গিয়ে বলল, ওকে কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জানেন ও ভয়ানক সর্বনেশে লোক। ও একটা কমিউনিস্ট, লাল। আপনারা করছেন কি? তাদের মধ্যে যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল সে এসব ভয় পেত না। কিন্তু আর একজন ডিরেক্টর খুব ঝামেলা করল। ওরা আমাকে গাড়ি পাঠান বন্ধ করল, আমাকে নিয়ে যেত কলকাতা থেকে শালকিয়ায়। আমাকে চাকরি ছেড়ে দাও বলল না, কিন্তু নানা অসুবিধে সৃষ্টি করল। অজুহাত তৈরি করল। আমি শেষে কোনো কারণ না দেখিয়ে বসে গেলাম। শেষে চাকরি ছেড়ে দিলাম। ফরাক্কা যখন হয় নি, ফরাক্কার প্রস্তাব হয়েছে, তখনই আমি ভীষণভাবে বিরোধিতা করেছিলাম। এবং মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষতি হবে এটা আমি বহুবার বিশেষ করে বলেছি। আমার বইতেও লিখেছি, ফরাক্কা করলে গঙ্গা-পদ্মার ক্ষতি হবে। পদ্মা তো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে, দুটো পাকিস্তান এক ছিল। আয়ুব খাঁ ওই পয়েন্টটা ধরে আমার বইটা (সিলটিং অব ক্যালকাটা পোর্ট) কিনে ইউ এন ও-তে পাঠিয়ে দিলেন। আর এখানকার ওরা আমাকে 'পাকিস্তানের দালাল' অপবাদ দিয়ে পুলিশি তদন্ত করিয়েছিল। পুলিশ আমার কোম্পানিতে গিয়ে দেখাও করে। তবে নানান কারণে শেষ অব্দি আর ধরে নি আমায়।

প্র : আচ্ছা ব্যারেজ তৈরি হয় মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু এও তো ঠিক যে ফরাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে দেশের ঘোরতর অকল্যাণ হচ্ছে?

উ : অকল্যাণ হবার বিশেষ কারণ ওই যে, জোয়ার খেলে, উল্টোদিকে জল আসে, এবং অনেক বেশি জল আসে। হুগলি নদীর মোহানাটা ১৫ মাইল চওড়া। ঐদিক থেকে যে বেশি জল আসে এবং তার সাথে পলি থাকে এটা ওরা ভাবে নি। কুশী নদীতে যে ব্যারাজ করেছে, আমি তার বিরোধী নই, তার সমর্থক।

যেগুলো একমুখী হিমালয়ে নদী সেগুলোতে যদি ব্যারাজ করে, ড্যাম করে খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গঙ্গাতে ব্যারাজ করে এরকম জায়গা নেই। নেপাল সরকারের সাহায্য নিতে হবে। দুই স্বাধীন দেশের বোঝাপড়া সহজে হয় না। দুই রাজ্য সরকারের মধ্যেই বোঝাপড়া হচ্ছে না, যেমন দক্ষিণ ভারতে নর্মদা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে দুই রাজ্য সরকারে। এসব কিছুতেই সমাধান হতে চায় না।

প্র : আপনি বলছেন হুগলি নদীতে জোয়ারের জল যাতে না ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থা করলেই এ অব্যবস্থার সমাধান হতে পারে।

উ : হ্যাঁ, জোয়ারের জল যাতে না ঢুকতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করলেই একমাত্র সমাধান হতে পারে।

প্র : এরকম তো বলা হয়, যেমন ধরুন ভাগীরথী; এদের অনেক বাঁকটাঁক থাকে তাতে মজে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সেগুলোর যদি সোজা সরল পথ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে তাদের গতি বাড়ে এবং পলি কাটে বেশি। এ সমাধানটা কেমন?

উ : খুব ভাল সমাধান কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। কেন না আমাদের এই হুগলি ভাগীরথী নদীর দুই কূলে এমন জনবসতি, এত প্রাচীন জায়গা, নবদ্বীপ যান না, সর্বত্র উচ্ছেদ করে নদী করবেন? সাহারাতে যেমন কঙ্গোর মতো একটা নদীর পথ বদলাবার প্রকল্প দিয়েছে ইঞ্জিনিয়াররা যাতে কঙ্গোকে সাহারা দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ফেলবার কথা। সেটা সম্ভব, কেন না সেখানে লোকজন নেই। কিন্তু তাও এটা হচ্ছে না, কারণ তিন চারটে সরকার একমত হচ্ছে না। সবসময় এরকম গোলমাল হয়।

প্র : ডঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে লিখেছিলেন ভারতের সব নদীগুলোর জন্ম উঁচু পাহাড়ে তাই এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রুশ দেশের থেকেও বেশি। বহুমুখী পরিকল্পনা ভারতের চেহারা পাল্টে দিতে পারে, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে একথা বারবার বলা সত্ত্বেও কিছুই করছে না— এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ : সব নদীতে সব পরিকল্পনা হয় না এ ব্যাপারটার ওপর উনি অত গুরুত্ব দেন নি। জলবিদ্যুৎ করলে, ড্যামগুলো করলে সাধারণভাবে একটা ক্ষতি হবেই। নদীর জল আটকালে নদীর পক্ষে সেটা খারাপও হতে পারে।

প্র : যে নদীগুলো হিমালয়ের দিক থেকে আসছে?

উ : সেগুলোও খারাপ হবে কিন্তু লোকের তত ক্ষতি হবে না। তবে ক্ষতি হবে না কি করে বলব। যেমন ফরাক্কার জল আটকানোর ফলে পদ্মায় চর পড়েছে, রাজশাহী শহর পদ্মা থেকে দু মাইল দূরে সরে গেছে, আগে যেটা নদীর পাড়ে ছিল। এরকম ক্ষতি তো হবেই। জল আটকালেই এরকম হবে। একদিকে চর, ফলে আগে যারা নদীর ধারে বাস করত তারা নদী থেকে দূরে সরে যাবে।

প্র : কিন্তু আমাদের ভাগীরথী এবং হুগলির বুকে দেখেছি বিশাল বিশাল চর। মাঝে তো দেখেছি চাষও অব্দি হচ্ছে ট্রাক্টর চালিয়ে, বাড়িঘর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে ১/২ কি মি জল এগিয়ে আসে কিন্তু শীতের সময় মনে হয় অনেক জায়গায় হেঁটে পার হওয়া যাবে। এসব কি ডি ভি সি করার পরই হল?

উ : হ্যাঁ, নদীর জল শুধু নয়, জলের সাথে পলিও আছে। উপর দিয়েও পলি আসে, জোয়ার দিয়েও পলি আসে। যখন নদীতে জলের গতি থাকে, জল পলি বয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে জোয়ারের জল আবার সেই পলি টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে জল যখন স্থির হয়, তখন সেই পলি নদীগর্ভে জমতে থাকে। পলিটা কাটাবার যদি কোনো ব্যবস্থা হয় যেমন ড্রেজার দিয়ে কাটে ফ্লাশিং ওয়াটার দিয়ে ডিভিসি-র জল দিয়ে নীচের প্রণালী কাটা হত বলেই হুগলি নদীর মোহানা থেকে কলকাতা পর্যন্ত নেভিগেশন চ্যানেলটা বজায় ছিল। কিন্তু সেটার এখন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। হলদিয়াতেও জাহাজ ভেড়াতে পারবে না কিছুদিনের মধ্যে কারণ ওটাও বুজে যাচ্ছে। সরকারি মহলও এটা বুঝেছে, তাই পারাদ্বীপে একটা পূর্বভারত বন্দর তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং তার উপর বেশি বেশি জোর দিচ্ছে। সেটা বুঝছে কলকাতা বন্দরের ওয়ার্কার্স ফেডারেশনও। এখনই ৩০,০০০ কর্মীর কাজ নেই, বলতে গেলে বসেই আছে। আগে এক কোটি টন মাল যাতায়াত করত কলকাতা বন্দর দিয়ে— স্বাধীনতার আগে। সেটা কমে এখন ৬০/৭০ লক্ষ টনেরও নীচে নেমে গেছে, যেখানে বম্বেতে তিনগুণ বেড়ে গেছে এই একই সময়সীমার মধ্যে। কলকাতা বন্দর মার খাচ্ছে বলে এখানকার শিল্পও মার খাচ্ছে। এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই ভারতের প্রধান শিল্প পাটশিল্প গড়ে উঠেছে। বন্দরটা ধ্বংস হচ্ছে বলে এই শিল্পাঞ্চলও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। না খেয়ে মরছে লোকে। শুধু কি তাই, অদূর ভবিষ্যতে ঐ হুগলি নদীর গর্ভ এত উঁচু হয়ে যাবে যে, তার জলপ্রবাহের তল মধ্য কলকাতার লেভেলে থেকে ১০/১২ ফুট উঁচু হয়ে বর্ষাকালে কলকাতাকে ডুবিয়ে রাখবে অনেকদিন ধরে। সে জল সহজে বারও হবে না। কারণ কলকাতার চারিদিকেই বাঁধ, কাজেই বেশি বৃষ্টি না হলেও নদীর প্লাবনের জলেই কলকাতা বর্ষাকালটাই ডুবে থাকবে। ওদিকে ফরাক্কা ব্যারাজের ফলে গঙ্গা-পদ্মার খাত মজে যাচ্ছে। তাই পদ্মার বন্যাও ঠেলা মেরে মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্লাবিত করে রাখবে। ১৯৭৮-এর প্লাবনে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

প্র : এর সমাধান কোথায়? আপনার পরিকল্পনা নিয়ে আপনি কিভাবে এগিয়েছেন?

উ : আমার প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছি, জ্যোতিবাবুর সরকারকেও দিয়েছি। জ্যোতিবাবু বলেন, আমাদের করবার কী আছে, কেন্দ্রীয় সরকার করছে না। আমাদের কত জিনিস করে না।

কথাটা অবশ্য খানিকটা সত্যি। তবে অজয় মুখার্জী যখন ছিলেন, উনি যদি আমাকে সমর্থন করতেন, তাহলে হতে পারত।

প্র : আচ্ছা, কেন্দ্রীয় সরকার এটা কেন মানছে না? কলকাতা বন্দর উঠে যাচ্ছে, বিধ্বংসী বন্যা বেশি বেশি করে হচ্ছে!

উ : ওখানটাতেই তো মজা। ১৯৪৮ থেকে '৫২ অব্দি আমি কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে পত্র-পত্রিকায় লিখে দৃঢ়ভাষায় আমার প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী জানাতে থাকি। কর্তৃপক্ষ কোনো সময়ই আমার যুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নি। তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ডিভিসি-র কর্তৃপক্ষকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডি ভি সি পরিকল্পনার কয়েকটা বাঁধ তৈরির কাজ তখনকার মতো বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরের দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস কে পাতিল আমায় দিল্লিতে আহ্বান করে হাই লেভেল ফ্লাড কণ্ট্রোলের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তো ওরা বলল, তুমি যা বলছ তা তো আমরাও বলছি। তোমাদের অতুল্য ঘোষকে থামাও। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা না চাইলে হবে কি করে? এমনই মর্যাদার অভিমান যে আমার যুক্তি তারা গ্রাহ্যই করল না।

প্র : অতুল্য ঘোষ এমন অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন কেন?

উ : না না অদ্ভুত কেন হবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য করবেই। আমার বক্তব্যটা পেশ করতে গেল কমিউনিস্ট পার্টি, ওতেই হল মুশকিল। রাজনীতির মজা হচ্ছে এখানটাতেই। কুমুদভূষণ রায়— আমি তাঁর শিষ্য বলতে পারেন। ডিভিসি-র ব্যাপারটা তিনিই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে

দেখান। অঙ্ক কষে বলেন যে এরা মিথ্যা বলছে।

প্র : কেন এরা মিথ্যে বলছে বার বার?

উ : সাধারণ মানুষকে টানতে হবে তো, না বুঝে একটা কথা বলে দিল তারপর গোয়ার্তুমি চলল। আমরা প্রতিবাদ করলাম। বামপন্থীরা সাহায্য করল। তারা জনসভা করেছে, 'দামোদর পরিকল্পনার সংস্কার চাই' বলে পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, চাপাডাঙ্গায় একটা বিরাট জনসভা হয়েছিল। ১০-১২ হাজার লোক জমা হয়েছিল। একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা করেছিলাম, ১৯৫৩ সাল নাগাদ। কিন্তু তাহলে কি হবে, আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের বড় অভাব। আমাদের সমসাময়িকরা বা আমাদের থেকে দশ বছরের ছোট যারা ভূগোল তাদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল না। সেই কারণে বুঝতেই পারত না এসব কী। দেশের ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি না জানলে কথাই বুঝতে পারে না। আমি নিজেই দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দিল্লি থেকে এসেছিলেন, জোয়ারের জল উজানে আসে— এ আবার কী? এতেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। বলে এ আবার হয় নাকি! নদী উল্টোদিকে বয় নাকি?

আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে আমি উপলব্ধি করেছি আমাদের দেশের যে ব্যবস্থায় এ জিনিসগুলো হয়, তাতে জনমত একটা বড় ব্যাপার। জনমত খুব জোর হলে তাতে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আমার ত্রুটি হচ্ছে আমি সেরকম জনমত তৈরি করতে পারি নি, বা সেভাবে সহায়তা পাই নি বন্ধুবর্গের কাছ থেকে। প্রথমে অল্প কিছু বন্ধুবান্ধবের সহায়তা দরকার হয়, পরে সেটা স্নো বলিং হয়ে অনেক বড় হয়। তা আমার জীবনে পারি নি। এখন তো চেষ্টা করলেও শারীরিকভাবে সম্ভব নয়।

প্র : আচ্ছা এরকম কি বলা যায় যে বামপন্থীরা যখন আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, তাদের নিজেদের পা তখন শক্ত ছিল না। তাই ব্যাপারটা তখন তত গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বামপন্থীরা যখন মজবুত হল তখন ব্যাপারটাকে তারা ইস্যু বলে ভাবলই না।

উ : হ্যাঁ, তার একটা পরিষ্কার উদাহরণ হচ্ছে যখন তারা ক্ষমতায় ছিল না তখন ফরাক্কা ব্যারাজের বিরুদ্ধে আমার দিকে ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় যখন এল তখন তারা ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প চালু করার জন্য লড়াই করতে লাগল। আমি বললাম এটা কি হচ্ছে? তাতে ওদের দিক থেকে বলা হল, সরকারের হাতের প্রকল্পটা হচ্ছে। আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, কিন্তু আরও অনেক লোক আছে তাদের অন্য মত আছে। ফরাক্কা ব্যারাজ করলে যতটা বাংলাদেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের) ক্ষতি হবে ততটা ভারতের নয়। দু-একটা জায়গায় বন্যা বাড়বে, কিন্তু খানিকটা জল এসে কানিকটা উপকার হবে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত হতে পারে না। পুরোদস্তুর না হলেও খানিকটা নাব্যতা বাড়বে। নৌকাগুলো ভাগীরথী থেকে গঙ্গায় যেতে পারবে, পাটনায় যেতে পারবে, আগে যেমন যেত, এগুলো তো বাস্তব সত্য।

প্র : আপনি কি মনে করেন ১৯৭৮ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা রোখা বা কমানোর ব্যাপারে মানুষ বেশি বেশি সচেতন হচ্ছে?

উ : '৭৮-এর পরে কিছুদিন তো আমিই অবাক হয়ে যেতাম। এত লোক আমার সাথে দেখা করে গেল। এত জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল। সচেতনতা বেড়েছে, আলোচনা হচ্ছে। আনন্দবাজার কখনও লেখা ছাপে নি, বরং ওরাই আমাকে 'পাকিস্তানের চর' বলে প্রচার করেছিল, সেই আনন্দবাজারের সাপ্তাহিক কাগজ 'ভূমিলক্ষী' আমাকে (এই 'পাকিস্তানের চরের' কাছে) ২০০ টাকা দিয়ে লেখা নিয়ে গেছে।

প্র : এসব ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা কি তারাই নেবে না যারা বন্যায় বেশি বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? তাদের মধ্যেই কথাগুলো বেশি করে প্রচার করতে হবে তো?

উ : সাধারণ মানুষ এত ছোট স্বার্থ নিয়ে থাকে যে তাদের ২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাতেই খুশি। বাগনান এলাকায় দেখেছি রিলিফ দিল বাড়ি বানানোর জন্য। খুব খুশি এতেই। ভাবল খেয়ে তো নি, তারপর বাড়ি পরে হবে না হবে দেখা যাবে। এই সমাজে এইসব মানুষদের রবীন্দ্রনাথ করুণা করতে বলেছেন।

এ তো গেল একটা দিক। অন্যদিকে দেশের মাথাদের চিন্তা তো পুঁজিবাদী ধাঁচের। লোকের woes and worries give them more profit than public happiness — এ তো চোখের ওপর দেখা যায়। খাবার-দাবারের দাম বাড়লে ওরা খুব খুশি হয়। তাই গণ আন্দোলন গড়ে না তুললে কিছুই হবে না।

উৎস মানুষ পত্রিকা, জুলাই-আগস্ট ১৯৮২

উমা

অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

চতুর্থ অংশ

এবার আসি আমার মহারাষ্ট্র বিষয়ক অভিজ্ঞতায়। বস্তুত ওড়িশা আর মহারাষ্ট্র ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থাৎ দুই প্রান্তের দুটি রাজ্যই কেবল নয়, অর্থনৈতিকভাবে মহারাষ্ট্র যতটা সমৃদ্ধ, ওড়িশা ততটাই পিছনে।

কিন্তু দুটো রাজ্যেই নিজের নিজের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় জল-জমি-জঙ্গল ও জীবন-জীবিকা বাঁচানোর আন্দোলন চলছেই।

গোরাই-মানোরি

এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিনোদন পার্ক 'এসেল ওয়ার্ল্ড'। ১৯৮৯ সালে 'মহারাষ্ট্র পর্যটন বিকাশ' আর 'এসেল কোম্পানির' যৌথ উদ্যোগে এই প্রয়াস শুরু হয়। ৭০০ একর মোট জমি। এই জমিটা কিন্তু ঠিক সমভূমি ছিল না। একটা খাঁড়ি দিয়ে নেওয়া দ্বীপ তার মধ্যে পাহাড় ছিল। এই খাঁড়ির যোগাযোগ ছিল সমুদ্রের সঙ্গে। ১৯৮৯ বা ৯০-এর শুরুতে যখন জমিবিক্রি শুরু হয়, তখন কিন্তু সরকারি বিজ্ঞাপনের বাগাড়ম্বরে ভুলে মানুষ কিছু তলিয়ে না বুঝেই জমি বিক্রি করে দেন। সেও নামমাত্র টাকায়। এরপর যখন পার্কটা তৈরি হয়, তখন বিপুল পরিমাণ বাদাবন, বাঁশবন, ধানক্ষেত নষ্ট করে জমিটা সমান করা হয়। খাঁড়ির ধার বরাবর পাঁচিল তুলে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে খাঁড়ি আর পাঁচিলের মধ্যে যে বাদাবন ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তখন স্থানীয় মানুষ বুঝতে পারেন যে ঠিক কী হতে যাচ্ছে। আর সেই সময় থেকেই তাঁরা জোট বেঁধে আন্দোলনে নামেন। একেবারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রথমে স্থানীয় প্রশাসন, পরে মুম্বইতে রাজ্য প্রশাসনের কাছে চিঠি লেখা, ধর্না দেওয়া, সবই করেছেন। শেষে অবরোধ শুরু করেন। বলা বাহুল্য সেই সময় পুলিশের লাঠি, স্থানীয় প্রশাসনের শাসানি সবই তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। প্রকল্প বন্ধ হয় নি কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে 'এসেল ওয়ার্ল্ড'-কে বলে, একটা চ্যানেল করে দেয়, যেটা দিয়ে খাঁড়ির জল অল্প হলেও বাদাবনে ঢুকতে পারে এবং বাদাবন কিছুটা হলেও বেঁচে যায়। আগেই বলেছি, সেই খাঁড়ির যোগ ছিল সমুদ্রের সঙ্গে। বর্ষার সময় তিন মাস এত মাছ সেই খাঁড়িতেই পাওয়া যেত, যে জেলেরা মাছ ধরতে সমুদ্র পর্যন্ত যেতই না। খাঁড়িতেই মাছ ধরত। এখন এই 'এসেল ওয়ার্ল্ড'-কে কেন্দ্র করে অনেক হোটেল হয়েছে, সেই হোটেলের বর্জ্য খাঁড়ির জলে পড়ে, আলাদা কোনও নিকাশি ব্যবস্থা নেই। ফলে খাঁড়ির জল এত দূষিত হয়ে পড়েছে যে মাছ আর আসে না। খাঁড়িটা বলা গেলে, নর্দমার কাজ করে। স্থানীয় মানুষের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা। ফলে, কেবল যে জীবিকায় টান পড়েছে, তাই নয় গোটা পরিবেশই অন্যরকম হয়ে গেছে। এলাকার পরিবেশকর্মী আমায় বলেছিলেন, 'এই একটা পার্কের জন্য কত মানুষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বলার কথা না। যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে একটা 'অ্যামিউজমেন্ট পার্ক'কে ঘিরে এতবড় কাণ্ড হবে। বাদাবন, খাঁড়ি সব যাবে। তবু তো তাঁরা কিছু পেয়েছিলেন, যাতে দু বছর অন্তত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তারপর সব ছত্রখান হয়ে গেছেন। কেউ কেউ শুনি ভিক্ষেও করেন। তবু তো তাঁরা দুটো বছর সময় পেয়েছিলেন, কিছু করার জন্য। কিন্তু খাঁড়িতে খেয়া পারাপার করতেন যে মানুষটি, ঐ একটা নৌকোর ওপর ভিত্তি করে তাঁর পরিবার বেঁচে ছিল। তার কী হবে? সে কথা কেউ ভাবল না! 'ক্ষতিপূরণ'-এর তালিকায় তাঁর কোনও স্থান নেই। তখন আমরা ভাবলাম, আমাদের ক্ষতির কথা আমাদেরই ভাবতে হবে। সকলকে সকলের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই আন্দোলনের শুরু...'

যে গ্রামে বসে এইসব কথা বলছিলাম, সেই গ্রামটির নাম গোরাই। তার পাশেই মানোরি। অঞ্চলটি মূল মুম্বই শহর থেকে তেমন দূরে নয়। বস্তুত মুম্বই পোস্টাল এরিয়ার মধ্যে। অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একেবারে সমুদ্রের কিনারে, অথচ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ফলে পর্যটনের পক্ষে একেবারে

আদর্শ। এখানকার মানুষের মধ্যেও সেই সচেতনতা আছে। তাঁরা চান, জায়গাটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠুক। কিন্তু প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে সেই পর্যটন কেন্দ্র করুক। মহারাষ্ট্রের সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষ প্রত্যেক বছর প্রায় নিয়ম করে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হন। এই সামুদ্রিক ঝড়ের হাত থেকে বাদাবন ছিল তাঁদের রক্ষাকবচ। এখন যাঁদের বয়স ৫০, সেইসব মানুষ, বিশেষত মৎস্যজীবী মানুষ তাঁদের বাল্য-কৈশোরে দেখা সামুদ্রিক ঝড়ের তুলনা করেন এখনকার ঝড়ের সঙ্গে এবং ক্ষয় ক্ষতির তুলনা করে একেবারে অঙ্ক কষে দেখানোর মতো করে দেখিয়ে দেন যে যেখানে যেখানে বাদাবন নষ্ট করে নগরায়ন হয়েছে, সেখানে সেখানেই ক্ষয় ক্ষতির হার অনেক বেশি।

'এসেল ওয়ার্ল্ড' যখন তৈরি হয়, তখন গ্রামবাসীরা সরকারি অফিসে খবর পাবার জন্য যাতায়াত শুরু করেন। নানা দপ্তরে যেতে হত। সেখানেই ওঁরা শোনেন যে এই অঞ্চলের ১০টি গ্রাম নিয়ে মাল্টিপারপাস এস ই জেড-এর পরিকল্পনা আছে সরকারের। এখানকার মানুষ জীবনে এই প্রথম 'এস ই জেড' কথাটি শোনেন। প্রথমে অর্থই বুঝতে পারেন না। পরে বিভিন্ন পরিবেশ-কর্মীদের এবং সমাজকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থ উদ্ধার করেন।

এই সমস্যার পাশাপাশি আরও একটি সমস্যা এই অঞ্চলে তৈরি হয়ে উঠছিল। গোরাই-মানোরির পাশে উত্তান-পালি গ্রামে একটি খোলা সরকারি জায়গায় 'ভাইন্দার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' এলাকার সমস্ত বর্জ্য ফেলে যেত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪০/৪৫ মিটার ওপরে এই জায়গাটা। সেখানে কালে কালে আবর্জনার পাহাড় হয়ে গেল। অসম্ভব দুর্গন্ধে এলাকার মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত কেবল নয়, এই ময়লা মাটির সঙ্গে মিশে পানীয় জলকেও দূষিত করে দিচ্ছিল। সাংসদ থেকে পুর প্রতিনিধি কোনও পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিই এই আবর্জনা সরানোর উদ্যোগ নেন নি। অনেকবার গ্রামবাসীরা মুখে এবং লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তখন ২০০৯-এ গ্রামের মানুষ এককাট্টা হয়ে 'পর্যাবরণ সংরক্ষণ সমিতি: নাগ্‌রি হক্ক' (অর্থাৎ সিটিজেন রাইট) তৈরি করে লড়াই শুরু করেন। এখানেও সেই ডেপুটেশন, ধর্না, অবরোধ, অনশন, সমস্তরকম গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। পাশাপাশি চলেছে আইনি লড়াই। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে জায়গাটি আবর্জনামুক্ত হয়েছে।

এই আন্দোলনের বিবরণ দিতে দিতে ওঁরা স্থানীয় এক বিধায়ক বিষয়ে ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। আবর্জনামুক্ত করার জন্য যখন আন্দোলন দানা বাঁধছিল, তখন ঐ বিধায়কও তাতে সামিল হন। এবং কিছুদিন পরে তিনি প্রস্তাব দেন, আর একটি বাদাবন অঞ্চলে ময়লা ফেলার। 'পর্যাবরণ সমিতি' রাজি হয় না। বিধায়কের দিক থেকে খুবই চাপ আসতে থাকে। গ্রামবাসীরাও বাদাবন বাঁচাতে শক্ত হয়ে দাঁড়ান। পরে বিধায়কের মতলব তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়। ঐ বাদাবনে মিউনিসিপ্যালিটি বর্জ্য ফেলতে থাকলে, ভবিষ্যতে সেই জমিটিকে পতিত জমি দেখিয়ে উনি এস ই জেড-এর অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন। গ্রামবাসীরা তাঁর লুকিয়ে রাখা মতলব বুঝতে পেরেছেন, এটা বোঝার পরই সেই বিধায়ক আন্দোলনের ওপর থেকে সব সমর্থন তুলে নেন। খানিকটা বিপক্ষেই চলে যান।

'এস ই জেড'-এর অর্থ বুঝে নেবার পর, যে সব জনপ্রতিনিধি এস ই জেড-এর প্রবক্তা, তাঁদের কাছে গ্রামবাসীদের খুব সাধারণ দুটি প্রশ্ন ছিল : প্রথমত, 'এত মৎস্যজীবী যে জীবিকা বিসর্জন দেবেন, মালটিপারপাস এস ই জেড তাঁদের কী ক্ষতিপূরণ দেবে?' দ্বিতীয়ত, 'এত মানুষের পুনর্বাসন কোথায় এবং কীভাবে হবে?' এই প্রশ্নের কোনও উত্তর সরকারি আধিকারিকেরা দিতে পারেন নি। তখন এই দুটি প্রশ্ন সামনে রেখে তৈরি হল 'গোরাই বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'। গ্রামবাসীরা জোট বাঁধেন। একেবারে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিরোধ তৈরি করেন। ১০,০০০ হাজার অবধি মানুষের সমাবেশ, রাস্তা রোকো, অবরোধ— নানাভাবে প্রতিবাদ হয়েছে। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। কেউই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। এবং এত মানুষের দায়িত্ব নিতেও পারেন নি।

সেইসব আন্দোলনের কথা বলতে বলতে ওঁরা বলেছিলেন, 'আমাদের এই অঞ্চলে এস ই জেড করতে দেব না আমরা। এতগুলো মানুষকে যদি সরকার বা কোনও কোম্পানি অন্য কোনও জীবিকার জন্য যথার্থভাবে প্রশিক্ষিত করতে পারে এবং জীবিকার গ্যারান্টি দিতে পারে, তবে তো জমি দেবার প্রশ্ন ওঠে! এইসব মৎস্যজীবীরা মাছের কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজে দক্ষ নন। ফলে, এরা ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেও জীবিকার কী হবে? পূর্বপুরুষের বাসস্থান, স্থায়ী জীবিকা তো মুখের কথায় ছেড়ে দেওয়া যাবে না।'

এই সব গ্রামের মূল অর্থনীতি দাঁড়িয়ে মৎস্য ব্যবসার ওপর। গ্রামগুলি যথার্থ অর্থে সম্পন্ন। এখানকার সামুদ্রিক মাছ শুঁটকি করে সারা পৃথিবীতে চালান যায়। সমুদ্রের ধার ধরে গ্রামের পর গ্রাম মানুষ এই ব্যবসায় জড়িত। আমি এই মৎস্যজীবী মানুষের আহ্বানে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছি এবং সম্পন্নতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। প্রত্যেকের বাড়িতে গ্যাস আভেন, ফ্রিজ, টিভি তো বটেই, এ সি-ও প্রায় সব বাড়িতেই আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। পড়াশোনা শিখেও, নিজের কুল কর্মেই থাকে মূলত। কেউ কেউ বাইরে যায় চাকরি বা ব্যবসা সূত্রে। মেয়েদের গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এই সম্পদ একদিনে হয় না। বংশ পরম্পরার পরিশ্রম আছে এর মধ্যে। কিন্তু এসব চলে যেতে যে এক বছরও লাগে না, এই জ্ঞান এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এনে দিয়েছে 'এসেল ওয়ার্ল্ড'-এর অভিজ্ঞতা। এই লড়াইতে দলীয় রাজনীতির কোনও লাঠালাঠি নেই। কে কাকে ভোট দেয়, তা নিয়ে কোনও প্রশ্নও নেই। জীবিকা বাঁচাতে সব গ্রামবাসীই এককাট্টা। এই আন্দোলনের এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(চলবে)

পাঠকের চিঠি

বোলান গঙ্গোপাধ্যায় 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার' দ্বিতীয় কিস্তিতে (উৎস মানুষ, এপ্রিল-জুন, ২০১৫) ওড়িশার গঞ্জাম জেলার টাটা কোম্পানির প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য জমি থেকে উৎখাত গ্রামবাসীদের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রথম লাইনে লিখেছেন 'এইবার যে আন্দোলনের কথা লিখব, সেই আন্দোলনটি মিডিয়ায় তেমন প্রচার পায় নি'। মিডিয়ায় কেন প্রচার পায় নি, সেই রহস্য প্রকাশ করার জন্য এই চিঠি। ১৯৯৫ সালের সম্ভবত জানুয়ারি মাসে অমি অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ায় নাস্তিক কেন্দ্র অনুষ্ঠিত বিশ্ব নাস্তিক সম্মেলন থেকে কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনেই একটি ইংরেজি কাগজে গোপালপুরের নিকট প্রস্তাবিত টাটার ইস্পাত কারখানা এবং একটি বেসরকারি বন্দর স্থাপনের চুক্তির কথা পড়ি। ঐ খবর পড়েই আমি বেরহামপুর স্টেশনে নেমে পড়ি। কোথায় গেলে তথ্য পাওয়া যাবে জানবার জন্য প্রথমে গোপালপুরে যাই এবং সারা দিন ঘুরে সন্ধ্যায় ছত্তরপুরের সি পি আই অফিসে স্থানীয় সি পি আই বিধায়ককে পাই। তিনি সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাটার প্রকল্প দেখে পার্টি অফিসে এসেছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে কলকাতায় ফিরে সংবাদ প্রতিদিনের সম্পাদক মশাইকে আমার লেখাটা দিই। আমি তাঁর কাছে জানতে চাই, আনন্দবাজার পত্রিকায় টাটা কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো লেখা ছাপা হয় না, আপনার পত্রিকায় এ ধরনের কোনো নির্দেশ নেই তো? তিনি আমাকে বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দেশ নেই, তবে আপনার লেখাটি ছাপাতে গেলে জানতে পারব, এ ধরনের কোনো নির্দেশ আছে কিনা। দুঃখের বিষয়, সংবাদ প্রতিদিনে আমার লেখাটা ছাপা হয় না। আনন্দবাজার পত্রিকার ভুবনেশ্বর-এর প্রতিনিধি অনমিত্র সেন তাঁর পত্রিকার জন্য প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ নিয়ে একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন। সেটি তখনও ছাপা হয় নি। আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি আশিস ঘোষ লোকসভার নির্বাচনী সমীক্ষায় বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী এলাকার সমস্যা নিয়ে লেখা পাঠাতেন। সেই লেখা সোজা প্রেসে চলে যেত। গঞ্জাম জেলায় টাটার প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার বিরুদ্ধে এলাকার গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভের খবর আশিস ঘোষের জন্য প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। তারপর আড়াই মাস ফেলে রাখা অনমিত্র সেনের পাঠানো লেখাটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

বিজ্ঞাপন ছাড়া টাটা কোম্পানি অন্যভাবে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতেন, অন্তত আমার সময়ে। বড় পত্রিকার সম্পাদক, সহসম্পাদক এবং প্রতিটি রিপোর্টারকে বিভিন্ন নামী শিল্পীর আঁকা ছবি দিয়ে বহু রঙের সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার এবং একটি ডায়েরি উপহার দিতেন। আবার বছরে একদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে নিমন্ত্রিত সাংবাদিকদের প্রচুর মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকত। টিসকোর জামসেদপুর অফিসের ডেপুটি পিআরও আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে মদ্যপানের অনুষ্ঠানে আসায় প্রেস ক্লাবে আমার মজা দেখার সুযোগ হয়েছিল।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায় টাটার প্রস্তাবিত কারখানার জন্য গ্রামবাসীদের আন্দোলন এবং তাদের দুঃখের কাহিনী শোনানোর জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

নিরঞ্জন হালদার

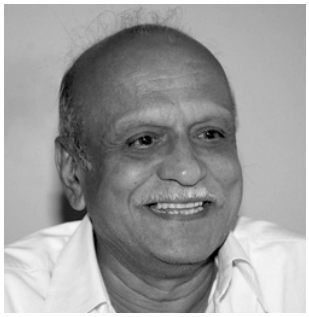

কালবুর্গি খুন, ঘুমে প্রতিবাদী রাজ্য !

পূরবী ঘোষ

গত এক দশকে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ শব্দ দুটির ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদ দেশে এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে যে তার জেরে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে অথচ তার কোনও প্রতিকার বা প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না। উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, যেখানে সুস্থ চিন্তা, মুক্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটছে, সেখানেই নেমে আসছে মৌলবাদীদের হাতের খড়্গ।

২০১৩ সালের আগস্ট মাসে মহারাষ্ট্রের চিকিৎসক ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের ওপর নেমে এসেছিল এই খড়্গ। তাঁর যুক্তিবাদী মন ও মুক্ত চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এই মৌলবাদীরা গুলি চালিয়ে। এরপর ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের যুক্তিবাদী মুক্তমনা বিজ্ঞানী অভিজিৎ রায়কে ওরা হত্যা করল নির্মমভাবে, কিন্তু তাতেই শেষ হল না তাদের রক্তের হোলিখেলা। ৬ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ৫ জন যুক্তিবাদী মুক্তমনাকে ওরা চিরতরে চুপ করিয়ে দিয়েছে। আশার কথা এই যে, মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার কিন্তু থেমে নেই।

গত ৩০ আগস্ট কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এম এম কালবুর্গির মৃত্যু হল এইসব মৌলবাদী তথা সন্ত্রাসবাদী ধর্মরক্ষকদের হাতে। সকাল ৭টার সময় ডঃ কালবুর্গির উত্তর কর্ণাটকের ধারওয়াড়ের বাড়ির দরজার বেল বাজিয়ে ভেতরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুজন হত্যাকারী। কালবুর্গির অপরাধ, তিনি হিন্দুধর্মের নগ্ন মূর্তিপূজা ও ব্রাহ্মণ্য আচার নিয়মের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। শুধু তাই নয় ডঃ কালবুর্গি একজন সুবক্তাও ছিলেন। তাই তিনি তাঁর বিশ্বাসকে বক্তব্যের মাধ্যমে জনসমক্ষে নিয়ে আসছিলেন। তিনি প্রায় ১০০-র বেশি বই লিখেছেন। তাঁকে ভাচানা সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ বলা যায়। সাহিত্য চর্চার জন্য অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

দ্বাদশ শতকের একজন দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক ভাসবান্না, সে যুগেও মূর্তিপূজার বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ২০১৪-র জুন মাসে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত কুসংস্কার বিরোধী এক আলোচনাচক্রে বলতে গিয়ে ডঃ কালবুর্গি তাঁর পূর্বসূরি কুসংস্কার বিরোধী লেখক প্রয়াত ডঃ অনন্তমূর্তির বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। এতে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি তাঁর ওপর রেগে যায় এবং খুনের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু কোনো হুমকি বা ভয় ৭৭ বছরের যুবক ডঃ কালবুর্গির কলম এবং বাগ্মিতাকে থামাতে পারে নি। তিনি তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের কাজ করেই যাচ্ছিলেন। আর তারই জন্য তাঁকে একেবারেই থামিয়ে দেওয়া হল গত ৩০ আগস্ট।

আগাগোড়া যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ এই মানুষটির হত্যার প্রতিবাদে উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় বনধ্ পালন করা হয়। শুধু তাই নয়, কর্ণাটক সরকার এবং পুলিশ হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি সি আই ডি দিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। অথচ আশ্চর্য যে, পশ্চিম বাংলায় এই ঘটনার কোনো ছাপ পড়ে নি। দৈনিক পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের কোনোটিতেই এ নিয়ে কোনও খবর প্রকাশিত হয় নি। এমনকি যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সিতেও এ নিয়ে কোনোরকম 'কলরব' শোনা যায় নি। কারণটা কি এটাই যে কর্ণাটকে, বাংলায় তো হয় নি, তাই শুধু শুধু চেঁচানো কেন?

ইদানীং কলকাতার ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত মানুষজন এতটাই নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছেন যে প্রতিবেশী দেশ বা রাজ্যের কোনো ঘটনাই তাঁদের আলোড়িত করছে না। ফলে উঠছে না কোনো প্রতিবাদের ঝড়। তবে এই ধর্মান্ধ ও নিয়মসর্বস্ব মানুষগুলো বোধহয় ভুলে যাচ্ছে যে, গ্যালিলিওকে নির্জন কারাকক্ষে ঢুকিয়েও সূর্যকে কিন্তু পৃথিবীর চারপাশে ঘোরানো যায় নি। সূর্য আজও স্থির এবং পৃথিবী আজও তার চারপাশে ঘুরছে। ঠিক তেমনি, একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েও মুক্তচিন্তা ও কুসংস্কার বিরোধিতাকে স্তব্ধ করা যাবে না। সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। উমা

কৃষ্ণ মোটেই ভগবান নন: অধ্যাপক ভাগবন

যুক্তিবাদী, অনুবাদক ও মহিশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির প্রাক্তন অধ্যাপক কে এস ভগবানের বয়স এখন ৭০। সম্প্রতি একটি বেনামী চিঠিতে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। অধ্যাপক ভগবান কিন্তু এতে মোটেই বিচলিত নন। ১৯৮৫ সালে এই রাজ্যোৎসব পুরস্কার প্রাপক যখন আদি শঙ্করাচার্যকে জাতিবাদী রূপে সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন, তখন থেকেই দক্ষিণপন্থী বিরোধিতা তাঁর নিত্যসঙ্গী। কন্নড় থেকে অনূদিত সৌম্য আজিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আবার বলেছেন যে, কৃষ্ণ মোটেই ভগবান নন বরং ভগবদ্গীতার কিছু অংশ বর্জন করা উচিত। সহকর্মী ও গবেষক এম এম কালবুর্গির সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের পরে কর্ণাটক সরকার তাঁর জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। পরিহাসচ্ছলে অধ্যাপক ভগবানের বক্তব্য— এতে তাঁর পড়াশুনা ও গবেষণার সুবিধাই হয়েছে।

এই ধরনের হুমকির ফলে যুক্তিবাদী চিন্তা কি সঙ্কটের মুখোমুখি?

সব ভাষাতেই যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা ও লেখাপত্র বহুদিন ধরেই রয়েছে। কন্নড় ভাষার প্রথম লেখক আদিকবি পম্পার সময় থেকেই এটা হয়ে এসেছে। আমার ধারণা, সমস্যাটা অন্যত্র। কেন্দ্রে এখন বিজেপি সরকার, আর প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদী। তাই এই লোকগুলো মনে করে, এটা তাদের সরকার এবং এ ধরনের অপরাধ করতে তাদের কোনো সমস্যাই হবে না।

আজকাল এই ধরনের কাজকর্ম অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি যা করছি তা কিন্তু মোটেই সংবিধান বিরোধী নয়। সংবিধানের ৫১ (এইচ) (৭) ধারায় বলা হয়েছে, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও মানবতার প্রচার করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। আমি ঠিক সেটাই করছি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের আমি কিন্তু বিরোধী নই।

বলা হচ্ছে যে, ভাগবদ্গীতা ও হিন্দুধর্ম নিয়ে আপনার সমালোচনা বহু মানুষের ভাবাবেগকে আঘাত করেছে।

বজরং দল ও আর এস এসের মতো কিছু সংগঠন বিশ্বাস করে, তারাই হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা এবং অন্য কারো এটা করার অধিকার নেই। কী রকম হিন্দুধর্মের তারা প্রচারক? সেটা নিছক নোংরা একটা ব্যাপার। প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহই নেই। প্রকৃত বিশ্বাস, প্রত্যয় নিষ্ঠা ও জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবেই তাঁর কাজ করে চলেন, এদের মতো আচরণ করেন না।

আপনি গীতার বিরোধী কেন?

আমি আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন লেখার একজন পাঠক। ভাগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৩২নং শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া সকলেই পাপী। সব মহিলা, এমনকি ব্রাহ্মণ মহিলাও, বৈশ্য ও শূদ্ররাও হল পাপী। এটা কী করে মেনে নেওয়া সম্ভব! গীতার পূর্বে রচিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রত্যেকেই আমরা অমৃতের সন্তান। বিবেকানন্দ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো মানুষকে পাপী বলাটাই হল পাপ। তাই গীতায় বর্ণিত এইসব ভাবনার সমালোচনা হওয়া উচিত, তা বর্জন করা উচিত। আমি এই বিশ্বাসে অটল। অবশ্যই গীতায় কিছু ভালো জিনিস রয়েছে। কিন্তু কিছু অতীব বিপজ্জনক ভাবনাও এতে উপস্থিত। কৃষ্ণ বলছেন যে, তিনি চতুর্বর্গ এবং জাতিপ্রথা সৃষ্টি করেছেন। এর মানে, তিনি উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সৃষ্টিকর্তা। এদিক থেকে বিচার করলে কী করে আমরা গীতাকে একটি মহৎ গ্রন্থ বলতে পারি?

হিন্দু দেবতার সমালোচনা করা মানে কি ধর্মবিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা করা নয়?

দেবতা কি ষোলো হাজার গোপিনীর অপহরণকারী হতে পারেন? রাধা তো অন্য একজনের স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে যে অপহরণ করেন সেই কৃষ্ণ কি সত্যিই দেবতা? দেবতারা তো অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী। অথচ, কৃষ্ণ যখন গাছের নীচে শুয়ে ছিলেন তখন এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। দেবতার মৃত্যু? আসলে কৃষ্ণ দেবতা ছিলেন না। কিছু মানুষ

নিজেদের সুবিধার জন্য তাঁকে দেবতা বানিয়েছে। কৃষ্ণের সব কথাই আমরা চোখ বুজে মেনে নিতে পারি না। তাঁর যে কথাগুলো ঠিক, সেটা মানতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেটা তাঁর ভুল, সেটাকে আমাদের ভুল বলতেই হবে।

যুক্তিবাদী চিন্তার কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা খর্ব করতে কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এই ধরনের হুমকি বন্ধ করা খুবই সহজ। দেশে যে আইন আছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এই ধরনের ঘটনায় রাজনীতিবিদেরা যেন নাক না গলান বা প্রভাব খাটান। এই ধরনের অপরাধে কেউ গ্রেপ্তার হলে তারা যেন তাদের মুক্ত করতে এগিয়ে না আসেন। পুলিশকে তার কাজ করতে দিলে তারা তা খুব ভালোভাবেই করতে পারবে। আমার মত হল, এই ধরনের অপরাধে অভিযুক্তদের সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এই ধরনের কাজে যুক্ত মানুষেরা সম্পদশালী, অর্থবান ও উদ্ধত। এরা মনে করে, কেউই তাদের ছুঁতে পারবে না। দু-একটি ক্ষেত্রে তারা যদি বুঝে যায় তাদের অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, তবেই তারা থামবে।

ভাষান্তর: পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্র: দ্য ইকনমিক টাইমস, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উয়ুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বর:** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

নিলয় নিছক ব্লগার নয় সক্রিয় আন্দোলনকারী

প্রতিবেদন: বাংলাদেশের ব্লগার নিলয় চট্টোপাধ্যায় জনজাগরণ মঞ্চের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কিছুদিন আগে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে খতম হয়েছেন। নিলয় যে শুধু মৌলবাদ-বিরোধী ছিলেন তাই নয়, একজন পরিবেশ আন্দোলনকারীও ছিলেন। বাংলাদেশে সুন্দরবনের পাশে এনটিপিসি ১৩০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ তৈরি করবার জন্য ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, রামপালে সেই বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পন্ন হলে ভয়ঙ্কর দূষণের সৃষ্টি হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুন্দরবনে এই প্রকল্প হলে, অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সেই কথা ভেবেই এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নিলয় চট্টোপাধ্যায়। নিলয়ের মৃত্যুতে যেমন একজন মৌলবাদী আন্দোলনের বন্ধুকে হারালাম, তেমনি হারালাম একজন বন্ধু পরিবেশ আন্দোলনকারীকেও।

বিবর্তন ভট্টাচার্য

সমকালীন রাজনীতি ও কাজী নজরুল

সুজাতা সেনগুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা একটু দূরে দূরে রাখতে চাই। সম্ভবত তিনি বিপজ্জনক বলে। আবেগপ্রবণ কবি-গীতিকার, স্বভাববিদ্রোহী। ফুল-পাখির স্বপ্নরাজ্য নয়, সমকালীন ঘটনাবলী বেশি করে নাড়া দিত। তাতেই জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিবিদদের দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই কখনও লিখেছেন 'জরাজীর্ণ বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব দেখায় গলিত মাংস চাকুরির মোহ/ যৌবনের টিকা পরা তরুণের দলে আনিয়াছে ভাগাড়ে শ্মশানে', বা 'যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি/ সেই তরুণের হাতে ভোটভিক্ষা ঝুলি বাঁধিয়া দিয়াছে হায়, রাজনীতি ইহা।', কখনও 'স্বরাজ আসিছে দেখ চেয়ে' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। সাম্যবাদ তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। লিখেছিলেন, 'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয়, নহে কিছু মহীয়ান।' স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন'। 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' চাওয়াকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, 'বগল বাজা দুলিয়ে মাজা বসে কেন অমনি রে/ ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি মা হবেন আজ ডোমনি রে।' রাজনীতি ও রাজনীতিক সম্পর্কে তাঁর উক্তি আজও প্রাসঙ্গিক।

কাজী নজরুলের জন্ম এক অতিদরিদ্র গ্রাম্য পরিবারে। গ্রামের কাছাকাছি স্কুল না থাকায় এবং আর্থিক অনটনের কারণে ছেলেবেলায় নজরুলের স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। গ্রামের নিম্ন মক্তবেই প্রাথমিক শিক্ষা। তবে পুরোপুরি নিজের চেষ্টাতেই তিনি বাংলা ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

অবশেষে একটু বেশি বয়সে বৃত্তি পেয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন। রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল। এই স্কুলে হস্টেলে তাঁকে থাকাখাওয়ার খরচ দিতে হত না। বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটককে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত নিবারণবাবু নজরুলের মনে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তৈরি করে দেন।

রানীগঞ্জেই পরবর্তীকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব। বিকেলে দুজনেই একসঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। নজরুল স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। তাঁর প্রধান দুটি স্বপ্ন ছিল কবি সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাঙালিদের নিয়ে একটি রেজিমেন্ট গঠন করে (৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট)। সেটা নজরুলের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার বছর। মেধাবী ছাত্র নজরুল লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিটিশ ফৌজে যোগ দিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, দেশকে স্বাধীন করতে গেলে উন্নত যুদ্ধবিদ্যা এবং নতুন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ জানা প্রয়োজন এবং এই সুযোগ তিনি যুদ্ধে যোগদান করেই কেবল পেতে পারেন।

নজরুলের কাজের জায়গা ছিল পেশোয়ারের কাছে 'নওশেরা'। এখানে থাকার সময়েই রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সৈন্যদল গঠন করে (লালফৌজ) অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই বিপ্লবের ঘোরতর বিরোধী ছিল। তবে এর প্রভাব কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সৈন্যদলে যুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের ভারতীয় সেনাদের ওপরও পড়েছিল। এই সেনানীদের একটা অংশ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করে লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র রায়ের স্মৃতিকথায় এই তথ্য জানতে পারি।

কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও গোপন পথে নজরুলের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক খবর পৌঁছে যেত। নজরুলের এক বন্ধু জমাদার শম্ভু রায়ের একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, রুশ বিপ্লবের খবর নজরুলকে খুবই উজ্জীবিত করেছিল। (প্রাণতোষ চক্রবর্তী)

ফৌজে থাকার সময়েই নজরুল সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা 'ব্যথার দান' শীর্ষক গল্পটি

১৯১৯ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার মাঘ মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রুশ বিপ্লব ও জারের পতন তাঁর মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল তার প্রতিচ্ছবি 'ব্যথার দান' গল্পে প্রতিফলিত। গল্পের ঘটনাস্থান—বেলুচিস্তান, গুলিস্তান, বুস্তান, চমন প্রভৃতি জায়গায়। এই অঞ্চলগুলি সবই রাশিয়ার কাছাকাছি।

১৯২০ সালে পল্টন ভেঙে দেওয়া হল। নজরুল পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে কয়েকদিনের জন্য নিজের গ্রাম চুরুলিয়া ঘুরে কলকাতায় এসে আড্ডা গাড়লেন, ৩২নং কলেজ স্ট্রিটের মেসে। এই মেসেই থাকতেন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মুজফ্ফর আহমেদ। তাঁরই ঘরে নজরুলের জায়গা হল। বয়সে ১০-১১ বছরের বড় মুজফ্ফর আহমেদ আজীবন ছিলেন নজরুলের প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃদ।

এই সময়েই ওঁরা দুজন অন্য দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বাংলা দৈনিক বার করার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য, দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মতামত জানাবেন। প্রধান সমস্যা দেখা দিল—কাগজ বার করার টাকা আসবে কোথা থেকে। তাঁরা এ কে ফজলুল হকের দ্বারস্থ হলেন। ফজলুল হক তখন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী। তাছাড়া কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনে জড়িত নেতাদের কাছের মানুষ। পরবর্তী কালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী (সেই সময় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকে বলা হত প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নয়) হয়েছিলেন। ফজলুল জানালেন প্রেস ও টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কাগজের নাম ঠিক হল 'নবযুগ'। মুজফ্ফর আহমেদ এবং নজরুল সব সময়ের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হলেন এবং এঁদের কয়েকজন বন্ধু সাময়িক কাজের জন্য নিযুক্ত হলেন। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বের হল। দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজটির প্রধান পরিচালক হিসাবে এ কে ফজলুল হকের নাম ছাপা হত। কাগজটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই আদৃত হয়েছিল।

ফজলুল হকের নির্দেশ ছিল 'নবযুগ' যেন কৃষক শ্রমিকদের সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরে। রাশিয়াতে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় এদেশের শ্রমিক শ্রেণীও যথেষ্ট উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য, দেশের অনেক জায়গাতেই তারা ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছিল। 'নবযুগে' ধর্মঘটের সমর্থনে 'ধর্মঘট' শিরোনামে নজরুলের একটি সম্পাদকীয় বের হয়। এই সম্পাদকীয়র কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

''কয়লাখনির শ্রমিকরা দিবারাত্র খনির নীচে পাতালপুরীতে আলো বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায়, কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া থাকে, কোম্পানী তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে, কিন্তু এ হতভাগাদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও কেহ চাহিবে না।

এই অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এই বিদ্রোহের ঝাঁকানি (ধর্মঘট)। এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহা সহজে নিভিবার নয়।''

শাসকদল ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লেখার জন্য সরকার দু-তিনবার 'নবযুগ'কে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু নজরুলের লেখনীকে থামানো যায় নি। এর কদিন পরেই 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে' এই শিরোনামে 'নবযুগে' নজরুলের একটি সম্পাদকীয় বের হল।

১৯২০ সালে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন হয়েছিল যার নাম ছিল 'হিজরৎ' আন্দোলন। আরবি ভাষায় 'হিজরৎ' কথার বাংলা প্রতিশব্দ স্বেচ্ছা নির্বাসন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮ হাজারেরও বেশি মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। যিনি এই নির্বাসন নিয়েছিলেন তাঁকে বলা হয় মুহাজির বা নির্বাসিত, বহুবচনে 'মুহাজিরিন'।

এই সম্পাদকীয়র কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম।

''মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

সামরিক পুলিশের সঙ্গে একজন মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একটি আঘাতের বদলেই তিন তিন বার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন্ সভ্য দেশের নীতি? চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই গেরেফতার করিয়া লইতে পারিতে, তাহা না করিয়া তোমরা চালাইলে গুলি! আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল!''

কাগজের এই সংখ্যাটি বের হবার পরই সরকার 'নবযুগ'

বন্ধ করে দেয়। প্রকাশনা শুরু হবার মাস তিনেক বাদেই কাগজটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২০ সালের ৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে। নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ 'নবযুগে'র প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও 'নবযুগ' তখন বন্ধ ছিল।

পরবর্তীকালে অবশ্য ফজলুল হকের চেষ্টায় 'নবযুগ' আবার প্রকাশিত হতে শুরু করল। কিন্তু নজরুল আর যোগ দেন নি। সম্ভবত তাঁর ইচ্ছেমতো লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা নাও থাকতে পারে ভেবেই।

১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নজরুলের রাজনৈতিক কাজকর্ম ও চিন্তাধারায় এবং সেইসঙ্গে তাঁর লেখালেখিতেও আসে সাময়িক বিরতি। তাঁর জীবনে আসে প্রণয়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য চলে আসেন কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামে, কিন্তু এই প্রণয়ের পরিণতি হয়েছিল অতীব বিষাদময়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নজরুল চলে এলেন শহরে, উঠলেন ইন্দ্রকুমার সেনের বাড়ি। ইন্দ্রকুমারের পুত্র বীরেন্দ্রকুমার সেন ছিলেন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তিনি স্কুলশিক্ষকতার কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন। এইখানে আসার কদিনের মধ্যেই নজরুলের মানসিক অবসাদ কেটে গেল। তিনি নতুন উৎসাহে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বক্তৃতা শুরু করলেন। কয়েকটি সভায় গানও গেয়েছিলেন।

১৯২১ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কংগ্রেসের ডাকা অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। কুমিল্লাতেও এর ঢেউ এসে পড়ে। স্থানীয় যুবকেরা অসহযোগ নিয়ে নজরুলকে গান লিখতে অনুরোধ করেন। তিনি লেখেন —

এ কোন্ পাগল ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙিনায়,
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়।
স্বাধীন দেশের বাঁধন ছেদন
কে এলোরে করতে ছেদন!
শিকলদেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়।

গানটি কুমিল্লার জনসাধারণের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল।

এরপর নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল।

১৯২২-এর ২২ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হল, কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায়। সারা দেশ কংগ্রেসের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। এই আন্দোলনের খাতিরে তখন বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রেখেছিলেন। সব জাতীয়তাবাদী নেতাদেরই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসনের, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কেউ তখনও তোলেন নি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ সমঝোতার ফলে দুটি সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন একই জায়গায় হয়ে আসছিল। ১৯২১ সালের এই দুটি সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল আমেদাবাদে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মৌলনা হজরত মোহানি সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু গান্ধীজির তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাস হতে পারে নি। মোহানিকে এই প্রস্তাব উত্থাপনের ফল ভোগ করতে হয়েছিল। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

'ধূমকেতু' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতীয় সংবাদগুলির মধ্যে 'ধূমকেতু'ই সম্ভবত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল। ১৯২২-এর ১৩ অক্টোবর তারিখে 'ধূমকেতু'তে লেখা হয়েছিল, "স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না।... শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।"

সরকার বিরোধী লেখার জন্য 'ধূমকেতু'র ওপর স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের নজর পড়েছিল। ৩২ নং কলেজ স্ট্রিট, যেটা ছিল ধূমকেতুর অফিস সেখানে সবসময়ই সাদা পোশাকের পুলিশের নজরদারি থাকত। কাগজটি তখন উঠে গেল ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেনে। এ বাড়িতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের অনেকেরই আনাগোনা ছিল। অবশেষে ১৯২২ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর, 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। কবিতাটির কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল —

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?"

প্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হওয়ার দু-চারদিন আগে থেকেই এ বিষয়ে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। অনেকেই নজরুলকে গা-ঢাকা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তরফে ভারতবর্ষের দায়িত্বে তখন এম এন রায়, থাকতেন রাশিয়ায়। ইনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদকে লিখলেন নজরুলকে ইউরোপ পাঠিয়ে দিতে। নজরুল রাজি হলেন না। চলে গেলেন কুমিল্লায়। সেখানেই ২৩ নভেম্বর ধরা পড়লেন।

প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট সুইন্‌হোর আদালতে বিচার হয়েছিল। বিচারক সুইন্‌হো নিজেও কবি ছিলেন। এক তরুণ উকিল মলিন মুখোপাধ্যায় নজরুলের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সুইন্‌হো নজরুলের কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে নজরুল বলেছিলেন, 'শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ খেয়া এই প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে; যার রক্ত-ঊষার নবশঙ্খ আমার অনাগত বিশালতাকে অভ্যর্থনা করছে,...'

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে এটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে ১৬ জানুয়ারি মামলার রায় বেরল। নজরুল এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে বন্দী করা হয়। সেখানে তিনি বিশেষ শ্রেণীর কয়েদি গণ্য হলেন, ১৪ এপ্রিল তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় হুগলি জেলে। এখানে নজরুল এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের বিশেষ শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয় নি। প্রতিবাদে নজরুল এবং আরও কয়েকজন রাজবন্দী আমরণ অনশন শুরু করলেন। নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তবে সে টেলিগ্রাম নজরুল পান নি। এদিকে নজরুলের খবর পেয়ে কুমিল্লা থেকে বিরজাসুন্দরী দেবী, বীরেন্দ্র সেনের মা, হুগলি চলে এলেন। বিরজাসুন্দরীর আদেশে নজরুল ৩৯ দিন পর তাঁর হাত থেকে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করলেন। ১৮ জুন নজরুলকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি রাজনৈতিক বন্দীর বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হলেন।

১৯২৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরই নজরুলের জীবনে ঘটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশালতা এবং গিরিবালা দেবীকে (কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনের স্বর্গীয় দাদার মেয়ে ও স্ত্রী) নিয়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। ৬নং হাজি লেনে ২৪ এপ্রিল নজরুল এবং আশালতার বিবাহ সম্পন্ন হল। বিয়ের পর নজরুল আশালতার নাম দিলেন 'প্রমীলা'।

এই সময়ে নজরুলের কোনও নিয়মিত রোজগারের পথ ছিল না। তাঁর লেখার স্বল্প উপার্জনেই সংসার চলত। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কলকাতা ছেড়ে হুগলিতে চলে এলেন। সেখানে আসার একটি প্রধান কারণ, জেলে থাকার সময় সেখানে দেশভক্ত বেশ কিছু তরুণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এছাড়া ভূপতি মজুমদার (পরবর্তীকালে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হয়েছিলেন) নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে যাবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

হুগলিতে নজরুল গান গেয়ে, আবৃত্তি করে তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একদিকে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারতব্যাপী চাঞ্চল্য, আরেকদিকে বিপ্লবী দলগুলি গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সমতালে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে দল পুষ্ট করে চলেছিলেন। এই দুই ধারাকেই খরস্রোতা করে রেখেছিল নজরুলের কবিতা ও গান। এরই পাশে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, আব্দুল হালিমরা ভারতে কমিউনিস্টদের সংগঠন করে চলেছেন।

সাম্যবাদের প্রতি নজরুলের দুর্বলতা ছিল প্রবল। তার ওপর মুজফ্‌ফর আহমেদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর ওপর। মুজফ্‌ফর কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে নজরুলকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন, নজরুল রাজিও হন। শেষ পর্যন্ত নজরুল নিজেকে কংগ্রেসি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে নজরুলের সাম্যবাদের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ নজরুলের কাছে অগ্রগণ্য বলে মনে হয়েছিল।

হুগলিতে নজরুলের সারাদিনটাই কাটত কর্মব্যস্ততায়। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি গান্ধী হুগলিতে আসেন। সেই উপলক্ষে নজরুল একটি গান রচনা করেছিলেন। গান্ধীকে গানটি খুবই আকৃষ্ট করেছিল।

আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে?
কংস কারার দ্বার ঠেলে,/ শব শ্মশানের শিব নাচে ঐ
ফুল ফোটানো পা ফেলে।

গান্ধীজির বোঝার সুবিধার জন্য নজরুলের বন্ধু সুবোধ রায় গানটির ইংরেজি অনুবাদ করে দেন। এখানে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, নজরুল গান্ধীজির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও চরকা ও খদ্দরের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আসবে, তা কখনই বিশ্বাস করতেন না। কবি মনে প্রাণে

ছিলেন বিদ্রোহী। কপটতায় অবিশ্বাসী। তাই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় সুরেন বাঁড়ুজ্জে, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জনদের সঙ্গে গান্ধীজিরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অহিংস আন্দোলন সহিংস চেহারা নিচ্ছে দেখলেই গান্ধীজি আন্দোলন থামিয়ে দিতেন বা নিজে ইংরেজের হাতে ধরা দিয়ে জেলে চলে যেতেন। এটি ছিল তাঁর প্রিয় কৌশল। তা নিয়েই নজরুল লেখেন, 'বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয় বছরী ফন্দি কারায়,/ চক্র তাঁহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায়।' আর এক জায়গায় আরও আক্রমণাত্মক, 'মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকী নাকী/ খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।'

এ পর্যন্ত নজরুল প্রধানত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে পরোক্ষে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হুগলিতে আসার পর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়ালেন। শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেশ কিছু শ্রমিকসভায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ১০ নভেম্বর হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন আহমেদ এবং নজরুলের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে The Labour and Swaraj Party of National Congress গঠিত হয়। ঐ পার্টির ইস্তাহার নজরুল কর্তৃক প্রকাশিত ও ঘোষিত। ১৯২৬ সালে নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ল।

এদিকে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকায় নজরুলের লেখনী স্তব্ধ—এটাই ছিল তাঁর উপার্জনের একমাত্র উপায়। দেনার দায়ে কবি জর্জরিত। সেই সময় সুভাষচন্দ্রের বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার নজরুলকে কৃষ্ণনগর যাবার পরামর্শ দেন। সেখানে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন। শোনা যায় হেমন্তবাবু নজরুলের সমস্ত দেনার দায় মিটিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকের মতে নজরুলকে কৃষ্ণনগর নিয়ে যাবার পেছনে হেমন্তবাবুর কিছুটা স্বার্থ ছিল। নজরুলের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। হেমন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন। নজরুল তাঁর প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। মুসলমান প্রধান কৃষকদের মধ্যে হেমন্ত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

নজরুল কৃষ্ণনগরে এলেন ১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি। ১৯২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে কয়েকটি সম্মেলন হয়েছিল। যে সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রথমটি হল নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন (৬/৭ ফেব্রুয়ারি), অ্যাডভোকেট এবং সাহিত্যিক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। নজরুলের 'শ্রমিকের গান' উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়েছিল। সভায় যোগ দিতে মুজফ্ফর আহমেদ, আব্দুল হালিম, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এসেছিলেন। এই সম্মেলনের আগে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়েছিল সেটির নাম হল বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক পার্টি। পরবর্তীকালে নামটি The workers' and peasants' party of Bengal করা হয়েছিল। পরে ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশেও পার্টি গড়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সারা ভারত মজদুর ও কৃষকদল সমূহের যুগ্ম সম্মেলন হয় এবং All India Workers' and Peasants' party গঠিত হয়।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের মুখপাত্র হিসেবে ১২ আগস্ট থেকে নজরুলের সম্পাদনায় 'লাঙল' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এরপর মুজফ্ফর আহ্মেদের সম্পাদনায় 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় নজরুল লিখলেন, 'কার্ল মার্কসের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং হবে। এই মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাইছেন এবং গড়ছেন। 'গণবাণী' কৃষক শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা 'গণবাণী' তাঁদের জন্য।'

কৃষ্ণনগরে যে সম্মেলনগুলি হয়েছিল তার জন্য নজরুল অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এই সম্মেলনের জন্য নজরুল উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করেন।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

এই সম্মেলন শুরু হওয়ার কিছু আগে কলকাতায় ঘটে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সে কথা স্মরণে রেখেই লিখেছিলেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ...সন্তান মোর মার।'

পরের সম্মেলন ছাত্র সম্মেলন, সভাপতি হয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। সেই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন তিনি। সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে নজরুল রচনা করলেন 'ছাত্রদলের গান'।

আমরা শক্তি আমরা বল/ আমরা ছাত্রদল

মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল/ আমরা ছাত্রদল।

এরপরে হয় যুব সম্মেলন। সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন মানিকতলা বোমা মামলার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তখন ইংরেজি সংবাদপত্র ফরোয়ার্ড-এর সহ সম্পাদক। এই সম্মেলনেও উদ্বোধনী সঙ্গীত লিখলেন নজরুল।

চল্ চল্ চল্/ ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল

বাংলায় এই মার্চিং সংটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এটি মার্চিং সং।

এইসব সম্মেলনের উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন নজরুল। ১৯২৬ সালের ২১ মে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু মার্শালের পোশাক পরে ভলান্টিয়ার পরিচালনা করেছিলেন।'

কৃষ্ণনগরে যখন এই সম্মেলনগুলি চলছিল সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। নজরুল সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ঘুরেছি অনেক শুনেছি জাতীয় গান, কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণমাতানো গান কখনও শুনি নি।' বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে তিনি লিখলেন, 'ভাই, জেলে যখন লোহার দরজা ওয়ার্ডার বন্ধ করে দেয় তখন মন যে কি আকুলি বিকুলি করে কি আর বলব। তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর গান:

কারার ওই লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদী।

কাজীকে ভাগ্যিস জেলে যেতে হয়েছিল, তাই তো বাংলাদেশ পেয়েছে এই কাব্য, এই প্রাণজাগানিয়া গান।'

নজরুল ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কাজ করে ফেলতেন। তেমন একটি কাজ ঢাকা বিভাগ (ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ নিয়ে ছিল এই বিভাগ) থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হিসাবে দাড়ানো। ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড অ্যাক্ট অনুযায়ী সম্প্রদায়গতভাবে নির্বাচন চালু হয়েছিল। এটা হল ১৯২৬। নির্বাচন লড়তে গেলে অর্থ ও লোকবলের প্রয়োজন। এর কোনটিই নজরুলের ছিল না। সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল না। এর ওপর তিনি ছিলেন সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। এরকম একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংরক্ষিত আসন থেকে জিতে আসা কঠিন। ফলে যা ঘটার তাই হল। তিনি পরাজিতই হলেন না, জামানতও জব্দ হল। আকণ্ঠ দেনায় জড়িয়ে পড়লেন।

যা বিশ্বাস করতেন, দেশের জন্য যা ভাল বলে মনে করতেন, তাকে রূপ দিতেই তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন। হুগলি এবং কৃষ্ণনগরে যখন তিনি প্রথম রাজনীতির আঙিনায় এলেন তখন বিবাহিত, সংসারে অনটন, কোনও কোনও দিন হয়ত উনুনে হাঁড়ি চড়ছে না , তিনি চলে গিয়েছেন দলের বা বন্ধুদের নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে। তাঁর উপার্জনের একটিই মাত্র পথ ছিল, লিখে কিছু রোজগার করা। এই লেখার কাজেও তিনি সময় দিতে পারেন নি, তাই দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

১৯২৮ সালের শেষদিকে নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন। বিয়ের পর হুগলি এবং কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন রাজনীতিতে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়ায় নজরুল কাব্য ও সঙ্গীত জগত থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় আসার পর ধীরে ধীরে তিনি সঙ্গীত জগতে নিজেকে বিলীন করে দিলেন। নজরুলের পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক জীবনের এখানেই সমাপ্তি ঘটল।

নজরুলের স্বল্পস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কারণ, জাতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী। নজরুল ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী, সাম্যবাদে ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। রাজনৈতিক আঙিনা থেকে পুরোপুরি সরে আসার পর ১২-১৩ বছর পরের ঘটনা। নজরুল তখন অনেকটাই মানসিকভাবে অসুস্থ। এদিকে সংসারে আর্থিক দৈন্য। এই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একটি ছেলে চাঁদা চাইতে আসে। নজরুল এক কথায় তখন তাঁর কাছে যে ১০০ টাকা ছিল চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। এই তথ্য আমরা মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের কাছ থেকে পাই।

তথ্য সূত্র:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৭০) জ্যৈষ্ঠের ঝড়। আনন্দধারা প্রকাশন।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৫) কাজী নজরুল। দেবদত্ত অ্যান্ড কোং।

মুজফ্‌ফর আহমেদ (১৯৬৫) কাজী নজরুল ইসলা- স্মৃতিকথা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

উমা

কোটি শিশু যে এতদিন নুডল্‌স বিষ গিলল!

অরুণ পাল

রঙিন মোড়কে প্যাঁচানো প্যাঁচানো সাদা কাঠির মতো দেখতে জিনিসগুলো জলে ফুটিয়ে মশলা মাখিয়ে খেয়ে নাও। দু মিনিটেই তৈরি হয়ে যাওয়া খাবারগুলো কী সুস্বাদু! ম্যাগি নামক ওই খাদ্যদ্রব্যগুলোর সঙ্গে আমরা যে প্রকৃতপক্ষে এতদিন ধরে বিষ গিলছি সেটা আজও টের পেতাম না, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ ডি এ) বিভাগ ম্যাগিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করত। ম্যাগিতে মানুষের শরীরের পক্ষে সহনশীল গ্রহণযোগ্য মাত্রার থেকে আট গুণ বেশি অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষে ভাগে (পার্টস পার মিলিয়ন) ১৭.২ পরিমাণ সীসা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও পাওয়া গিয়েছে মনোসেডিয়াম গ্লুটামেট নামে একটি যৌগ, যেটা কারও কারও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ম্যাগির ঘটনা জলে ভাসমান বরফের জলের ওপরের অংশটুকুর মতো। জলের নীচের চোখের আড়ালে থাকা বিশাল পরিমাণ অংশ অর্থাৎ এফ ডি এ-এর হাতে ধরা না পড়া কতশত ভেজাল মেশানো খাদ্যদ্রব্য আমরা আমাদের অজান্তে শরীরে গ্রহণ করছি তার কোনো হিসাব নেই। খাদ্য নিরাপত্তার এই বিষয়টা আমাদের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরে যেগুলিতে প্রবেশের আগে আমরা জেনে নেব কীভাবে এফ ডি এ-র হাতে ম্যাগি ধরা পড়ল।

ম্যাগির ভেজাল ধরার ব্যাপারে প্রধান কৃতিত্ব লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত বারাবাঁকি শহরের এফ ডি এ অফিসে কর্মরত আধিকারিক সঞ্জয় সিংহের। গত বছর ১০ মার্চ তিনি রুটিন মাফিক ভেজাল ধরার অভিযানে বেরিয়ে বারাবাঁকিতে ম্যাগির উৎপাদক সংস্থা নেস্‌লের গুদাম থেকে কয়েক প্যাকেট ম্যাগির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য গোরখপুরের সরকারি রসায়নাগারে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই ধরা পড়ে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেটের অস্তিত্ব। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সঞ্জয়বাবু আবারও পরীক্ষার জন্য আরও কয়েক প্যাকেট নমুনা গোরখপুর পাঠিয়ে দেন। এবং এবারও পরীক্ষায় একই ফল পাওয়া গেল। কিন্তু কোম্পানি কলকাতার কেন্দ্রীয় খাদ্য রসায়নাগার থেকে পরীক্ষার দাবি জানায়। কলকাতার রসায়নাগারের পরীক্ষায় আরও মারাত্মক ফল পাওয়া গেল। সেখানে পাওয়া গেল ম্যাগিতে সীসার অস্তিত্ব। সঞ্জয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানান এবং তারপরই ম্যাগিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এবার আমরা খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা মুনাফার স্বার্থে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে নানা সুস্বাদুবর্ধক জিনিস, কীটনাশক পদার্থ মিশিয়ে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে দিয়ে প্রায় তৈরি খাবার রঙচঙে মোড়কে বাজারে হাজির করে। এতে স্বাস্থ্যহানিকর নানা পদার্থ খাদ্যে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রকৃত উৎপাদন মূল্যের থেকে অনেক বেড়ে যায়, যার বেশিরভাগটাই যায় ব্যবসায়ী সংস্থার পকেটে আর পাশাপাশি সম্পদেরও অপচয় ঘটে। ওয়েনডেল বেরি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিস্ময়গুলির মধ্যে এটা একটা যে আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলিতে যেসব জীবাণুতে আমরা অভ্যস্ত তাদের অপসারিত করছি বিষ দিয়ে।' কথাটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। ১৯৮৬ সালের লন্ডন ফুড কমিশনের রিপোর্ট বলছে, প্রাণীদের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে ব্রিটেনে অন্তত ৯২টা কীটনাশক খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা হয় যেগুলির ক্যানসার ঘটাতে পারে, ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম দিতে পারে বা জিনগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খাদ্য প্রতিক্রিয়াকরণ শিল্পে সংখ্যা ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই ব্যাপকভাবে খাদ্যে নানারকম জিনিস মেশান হচ্ছে যার সংখ্যা ১৯৮৮-তে লন্ডন ফুড কমিশনের হিসেব মতো প্রায় ৩৮০০টি যার দশভাগের মাত্র এক ভাগের ওপর রয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। কমিশন তার রিপোর্টে উল্লেখ্য করেছে,

একবার খাবার খেলেই ১২ থেকে ১৬টি আগন্তুক পদার্থ শরীরে ঢুকে যেতে পারে, যাদের নিজেদের মধ্যে এবং খাদ্যের সাথে বিক্রিয়ায় ক্ষতিকারক নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হতে পারে।

এ তো গেল খাদ্যদ্রব্যে বাইরে থেকে বিষ ঢোকানোর ব্যাপার। আবার মজার ব্যাপার হল, অন্যদিকে চলছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ও পরিশোধনের নামে পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি খাদ্যদ্রব্য থেকে অপসারণ। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এল রামচন্দ্রন তার একটি বই-এ (ফুড প্ল্যানিং - সাম ভাইটাল অ্যাসপেক্টস্) উল্লেখ করেছেন সাধারণ চালকলগুলিতে চালকে ছেঁটে ও পালিশ করে যে সরু ও সুন্দর করা হয় তাতে চালের মধ্যে থাকা শতকরা ৮ থেকে ১৬ ভাগ জিনিস হারিয়ে যায়, অতিরিক্ত শোধন করা চালের প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ জিনিস চলে যায়। বর্তমানে, চাল ও ময়দাকলগুলিতে শস্যদানার পুষ্টিকর জিনিসগুলি ছাঁটাই করে সেগুলি গবাদি পশু ও পোলট্রির পাখিদের খাবার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রামচন্দ্রনের হিসেবমতো এইভাবে শস্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা বছরে খাদ্যশস্যের মধ্যে থাকা কমপক্ষে ৮০ লক্ষ টন পরিমাণ জিনিস অপচয় করছি যেটা ভারতের মতো একটি গরিব দেশে মোটেই কাম্য নয়। পুষ্টিকর জিনিসের আর একটি বড় অপচয় ঘটছে তৈল জাতীয় পদার্থ বা তথাকথিত বনস্পতি ঘি উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে রান্নার প্রধান উপকরণ হিসেবে বনস্পতি ঘি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রাকৃতিক তেলকে প্রথমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গন্ধহীন ও রঙহীন করা হচ্ছে। তারপর নিকেলকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে অসম্পৃক্ত ও বহু অসম্পৃক্ত (পলি আনস্যাচুরেটেড) ফ্যাটকে পরিণত করা হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটে যা অতিরিক্ত গ্রহণে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অসম্পৃক্ত ফ্যাট, বিশেষ করে কয়েকটি বহু-অসম্পৃক্ত ফ্যাট পুষ্টির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ এবং এগুলি হৃদ্‌পিণ্ড নালিকা সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ ভাল ভূমিকা পালন করে। রামচন্দ্রনের ভাষায়, 'এই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যা কিছু ভাল এবং প্রয়োজনীয় তাকে পরিণত করা হচ্ছে যা প্রয়োজনীয় নয় এবং যেগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও।'

পুষ্টি বিশেষজ্ঞ থাঙ্কাম্মা জ্যাকব বলেন যে, আজকাল বেশি বেশি লোক আত্মঘাতী খাদ্য তালিকায় ক্রমশ অভ্যস্ত হচ্ছেন। এই ভয়াবহ পরিবর্তনে অর্থাৎ স্বাভাবিক খাদ্যের বদলে ভীষণরকম পরিশোধিত, রঙ ও গন্ধযুক্ত আকর্ষণীয় খাদ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে শিশুদের। তিনি লিখেছেন, 'পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির কয়েকটি সমীক্ষায় জানা গেছে পশ্চিমী ধরনের খাদ্যতালিকা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বেশ কয়েকটি রোগ যেমন মোটা হয়ে যাওয়া, হার্টের রোগ, হাইপারটেনশন, আর্থারাইটিস, পাইলস্, ডায়াবেটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্যানসার এবং সর্বোপরি নানা ধরনের অ্যালার্জির জন্য দায়ী।

সময় দাবি করছে এক শক্তিশালী ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনের যা স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে এবং মানুষকে খাদ্যের নামে বিষ গেলা থেকে নিবৃত্ত করবে।

[তথ্যসূত্র : The Statesman 10 June, 2015 & The Telegraph 5 July, 2015]

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: বাঙালি মননে বিজ্ঞান চেতনা

বক্তা: স্বপ্নময় চক্রবর্তী

স্থান: বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘর
শনিবার, ২৮ নভেম্বর ২০১৫, বিকেল ৫টা

প্রবেশ অবাধ

সন্তান-প্রতিপালন ছুটি: বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সঙ্কট

ইমনকল্যাণ জানা

গোটা দেশে দুটো বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সবার ওপরে– শিক্ষা আর স্বাস্থ্য। ৭০ দশকের পর থেকেই অবনমনের শুরু। এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ডের মতো গুটিকয় রাজ্য। এক সময় সরকারি এবং সরকার-পোষিত স্কুলগুলিই ছিল একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র। ক্রমশ সরকারি উস্কানিতে ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরি হতে থাকল বেসরকারি স্কুল। বিদ্যা এখন আর পাঁচটা ভোগ্যপণ্যের মতো, ফেলো কড়ি মাখো তেল। ধাক্কাটা বেশি পড়েছে মেয়েদের স্কুলগুলোর ওপর। বাম জমানায় দলের সর্বসময়ের কর্মীর স্ত্রীকে স্কুলের চাকরি দেওয়া শুরু হয়। ফলে শিক্ষিকাদের গুণমান গোল্লায়। এখন তো ধুঁকতে থাকা সরকারের কাছে স্কুলগুলো বোঝা। কোষাগারের যা অবস্থা, উঠে গেলেই সরকার বাঁচে। হয়ত এই কারণেই এমন সব নীতি নির্ধারণ হচ্ছে, যাতে স্কুলগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে এগোয়। ইতিমধ্যে কলকাতায় কত স্কুল যে উঠে গিয়েছে তার হিসেব নেই। উত্তর কলকাতায় বিডন স্ট্রিটের কাছে বীণাপাণি পর্দা হাইস্কুল নামে মেয়েদের একটি স্কুল ছিল। নামডাকও ছিল। ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়ালের মতো এখন গেলে দেখা যাবে, সেখানে একটি বহুতল দাঁড়িয়ে। এই রকম শুধু উত্তর কলকাতায় চক্কর কাটলে সব পাড়াতেই একটা-দুটো মেয়েদের স্কুল উঠে যাওয়ার খবর মিলবে। আমরা দেশ-বিদেশের এত বড় বড় খবর নিয়ে মাথা ঘামানোয় ব্যস্ত থাকি, যে এই আপাততুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাবার সময় পাই না। সরকারি হাসপাতাল এমন কৌশলে চলে, যাতে লোকেরা ওরে বাপ রে বলে বেসরকারি হাসপাতালে ছোটে, স্কুলের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। বেসরকারি স্কুল, বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভিড় সামলানো দায়। যারা সরকারি স্কুলগুলোয় পড়ে, তাদের সন্তানেরা বেশিরভাগ দিন স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করে না। কারণ ক্লাস হয় না। মাথাপিছু চার-পাঁচটা প্রাইভেট টিউটরের ঠেকনাতেই পড়ুয়ারা পরীক্ষা বৈতরণী পার হয়। সন্তান প্রতিপালন ছুটি, সমস্যাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। অফিসের থেকে স্কুলে সমস্যাটা বেশ প্রকট। অনেকে সন্তান প্রতিপালনের ছুটি নিয়ে বেড়াতেও চলে যাচ্ছেন। তা যান, তাঁর ছুটি তিনি কীভাবে কাটাবেন, আমরা বলার কে! এই নিবন্ধে সমস্যাটিকে তুলে ধরা, কিছু শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীর সুবিধা কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশে নয়, স্কুলগুলির পঠনপাঠন সচল রেখে তার অকালমৃত্যু ঠেকানো।

বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের চিন্তারও শেষ নেই। অনেক লেখালেখি ও গবেষণাপত্র ছাপা হচ্ছে। কেউ কেউ বড়সড় ডিগ্রিও লাভ করে থাকতে পারেন। কিন্তু কাজের কাজটা কিছুই হয় নি। বিষয়টি হল আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়গুলি থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ অনুসন্ধান। ব্যাপারটা হঠাৎ জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া বা সন্ত্রাসবাদী হামলা নয়, যে তাৎক্ষণিক ভাবনাচিন্তা জরুরি। এটা এমন একটা বিষয় যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলছে ধীরে। যার পরিণতিতে সমগ্র জাতির পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। যে কারণে এত কথার মুখবন্ধ তার মূল উপজীব্যে প্রবেশ করা যাক।

গত ১৭ জুলাই ২০১৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে একটি মেমোরান্ডাম জারি করা হয়। এতে এ রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের এবং অশিক্ষিকা কর্মচারীদের আপন সন্তান প্রতিপালনের

জন্য সমগ্র কর্মজীবনে ২ বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা যারা অফিসকাছারিতে কাজ করি, তাদের কাছে ছুটি মানেই আনন্দের, উপভোগের। কিন্তু এই ধরনের ছুটির একটি কুপ্রভাবও রয়েছে। তার ওপর আলোকপাত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। মেমোরান্ডামটি ১৭ জুলাই সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের সম্মাননীয়া প্রধান কয়েকদিন পূর্বেই সদর্প বিভিন্ন মঞ্চে ঘোষণা করেছেন। যাই হোক, ভালমন্দ বিচারের আগে এই ছুটির কিছু বিশেষ নিয়মকানুন দেখে নেওয়া যাক। সাধারণ নিয়মাবলী মতে কোনো স্থায়ী শিক্ষিকা বা মহিলা অশিক্ষক কর্মচারী ৭৩০ দিন বা ২ বছর সবেতন ছুটি পেতে পারেন : (১) তাঁর সন্তান যদি ১৮ বছরের কম হন এবং সর্বাধিক ২ বছরের জন্য প্রযোজ্য; (২) এই ছুটিটা সারা বছর সর্বাধিক ৩টি পর্যায়ে নেওয়া যেতে পারে; (৩) এই ছুটিটা একসঙ্গে ১৫ দিনের কম নেওয়া যাবে না; (৪) অন্য কোনো ছুটি থেকে এটি বাদ যাবে না; (৫) এই ছুটির ক্ষেত্রে যে শূন্যস্থান তৈরি হবে সেখানে সরকারিভাবে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যোগদান করতে পারবে না; (৬) এই ছুটিটা সন্তান-সন্ততিদের অসুস্থতা, তাদের পরীক্ষা ইত্যাদির কারণে নেওয়া যাবে।

এখনো পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সন্তান-সন্ততি পালনের ছুটির ক্ষেত্রে এইসব নিয়মগুলিকেই সরকারি নিয়মে প্রকাশ করা হয়েছে।

আসুন কিছু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মোটামুটিভাবে এই ছুটির আওতাভুক্ত শিক্ষিকা এবং মহিলা অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্য ও তাদের অবস্থানটা দেখে নিই। গোটা রাজ্যের তিনটি জেলার ২০টি বিদ্যালয়ের মহিলা কর্মচারীর অবস্থান সংক্রান্ত সারণী দেওয়া হল। সমীক্ষা করা এই ২০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০টি বিদ্যালয় বালিকাদের ও ১০টি বিদ্যালয় কোএড/বালকদের। ১০টি বালিকা বিদ্যালয় —

মোট কর্মচারী পদের সংখ্যা (শিক্ষিকা ও অশিক্ষক)	বর্তমানে কতজন কর্মরত	সন্তান প্রতিপালন ছুটি বর্তমানে নেওয়ার উপযুক্ত কর্মচারী
২০৩	১৪৭	৯৮

কোএড/বালকদের বিদ্যালয় —

মোট কর্মচারী পদের সংখ্যা (শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক)	বর্তমানে কতজন কর্মরত	সন্তান প্রতিপালন ছুটি বর্তমানে নেওয়ার উপযুক্ত কর্মচারী
২১২	১৬৬	৩৫

এই ২০টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৬৫৪ জন এবং এই ২০টি বিদ্যালয়ের মোট ৬ জন প্রধান শিক্ষিকা রয়েছেন যাঁরা নিজেরাই সেই সন্তান প্রতিপালন করার ছুটি নিতে পারেন।

নিজের সন্তানকে দেখভাল করে সুনাগরিকরূপে দেশের এবং সমাজের একজন করে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক। আর এজন্য সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই ধরনের ছুটিকে সর্বদাই স্বাগত জানানো উচিত। এছাড়া দেখা যায় কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশেরই স্বামী কর্মরত হন, যার ফলে সন্তানসন্ততিরা অবহেলিত হয়ে থাকে পিতামাতার অনুপস্থিতির কারণে। বর্তমানে ছোট পরিবার সেই সমস্যাকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। যে কারণে কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অফিসে অতিরিক্ত ছুটি চালু করেছে।

কিন্তু সরকারি অফিস এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে মূলগত কিছু ফারাক রয়েছে। মনে হয় সেটা আমাদের নীতি নির্ধারকেরা বোঝেন নি বা বুঝেও বুঝতে চান নি। এর মধ্যে কোনটা ঠিক, সে ব্যাপারে নিবন্ধের একেবারে শেষে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু প্রথমেই দেখা যাক, কোন কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে এই ছুটির ফলে। প্রথমেই ভেবে দেখতে অনুরোধ করা যাক পাঠকবর্গকে, যে কোনো একটি বিদ্যালয়ে মাত্র ২৪ শতাংশ শিক্ষিকা উপস্থিত রয়েছেন, সে ক্ষেত্রে উক্ত বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের অবস্থাটা ঠিক কতটা খারাপ হতে পারে তা পরিমাপ করা সম্ভব না হলেও অবস্থাটা যে ভয়াবহ হবে তা বলাই বাহুল্য। পরিসংখ্যানের ব্যাপারে ফিরে আসা যাক। ১০টি বালিকা বিদ্যালয়ের ২০৩টি পদে বর্তমানে ১৪৭ জন কর্মচারী রয়েছেন অর্থাৎ এমনিতেই প্রায় ৩০ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে, এর মধ্যে যদি আরো ৯৮ জন একসঙ্গে ছুটি নিয়ে নেন অর্থাৎ প্রায় ৭৬ শতাংশ পদ শূন্য হয়ে যাবে। মাত্র ২৪ শতাংশ কর্মচারী নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়গুলি যদি চলতে থাকে তবে পঠনপাঠনের হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সহজেই অনুমেয়। এটি হল শুধু সন্তান প্রতিপালনের জন্য নেওয়া ছুটি। অন্যান্য কর্মচারীদের সাধারণ অনুপস্থিতি তো লেগেই থাকবে এর সঙ্গে। অর্থাৎ সাধারণ ছুটি হল ক্যাজুয়াল লিভ (সি এল), মেডিক্যাল

লিভ (এম এল) ইত্যাদি। চিত্রটি সামান্য ভাল কোএড বা ছেলেদের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হলেও খুব আলাদা কিছু নয়। মোট ১০টি কোএড এবং ছেলেদের বিদ্যালয়ে (কোএড ও বালক বা ছেলেদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকা উভয়ে কর্মরত হতে পারেন) বর্তমানে ২১২টি পদে ১৬৬ জন অর্থাৎ ৭৮ শতাংশ মতো রয়েছেন। বর্তমানে ৩৫ জন এমন রয়েছেন যাঁরা সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটি নেওয়ার আইন মেনে ছুটি নিতে পারেন। যদি একসঙ্গে সকলে ছুটি নিয়ে নেন তবে বিদ্যালয়গুলোতে মাত্র ৬১ শতাংশ পাঠদান করার জন্য থাকবেন। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এই ছুটির পরিবর্তে সরকার অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে না। যেটা মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক মহিলা দুজন সন্তানের জন্য মোট ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়ে থাকেন। যে ছুটিতে থাকাকালীন বিদ্যালয় উক্ত স্থানে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারেন একই মাসোহারা দিয়ে। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু সন্তান প্রতিপালন ছুটির ক্ষেত্রে তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সরকারি অফিস মহিলাদের ছুটি দিলেও সমস্যা হবে কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু সরকারি অফিস একেবারে অচল হয়ে যাবে না, কারণ অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিপূরক ব্যক্তি হতে পারেন পাশের একজন। এক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতিটা মূলত ক্লারিক্যাল, কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। এখানে প্রতিটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ থাকেন। একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক কখনোই বাংলা শ্রেণীতে গিয়ে পড়াতে সক্ষম হবেন না এবং বিপরীতটাও ঠিক। বিদ্যালয়ে একজনের পরিপূরক হয়ে ওঠা অন্যজনের পক্ষে খুবই কঠিন। মূল কথা হল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পর্কটা শ্রেণীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। সেই গড়ে ওঠা প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গই হল পাঠদান। যে পাঠ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে বা বারে বারে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য যদি শ্রেণীতে শিক্ষিকা উপস্থিত না হন তবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষিকার সম্পর্ক ও পাঠদান প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। সাধারণভাবে বিদ্যালয়গুলোতে যেটা চালু পদ্ধতি সেটা হল কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা অনুপস্থিত হলে তাঁর জায়গায় সাময়িক সময়ে অন্য কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা দিয়ে সেই স্থান পূরণ করা হয়। প্রথাগতভাবে এই ক্লাসকে বলা হয় প্রভিশনাল ক্লাস। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রভিশনাল ক্লাসের একটা উদ্দেশ্য হল পার্শ্ববর্তী শ্রেণীর যেন কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু প্রভিশনাল ক্লাস কখনো মূল ক্লাসের পরিপূরক হতে পারে না। এখানে কোনো বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষিকা যদি বারবার নিজেদের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে ইচ্ছেমতো ছুটি নিতে থাকেন, তবে অবশ্যই পাঠদানে সমস্যা হতে বাধ্য। এছাড়া বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে এই সন্তানসন্ততির প্রতিপালন ছুটির জন্য পাঠদানকারীর সংখ্যা এতটাই কমে যেতে পারে যে প্রভিশনাল ক্লাসের জন্য শিক্ষক/ শিক্ষিকাও পাওয়া যাবে না। এমনিতেই বর্তমানে যখন প্রবন্ধটি লেখা চলছে তখনো পর্যন্ত প্রায় দু বছর রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন কারণে (যে কারণগুলো বিশদ এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয় স্থানের কারণে। সেটা অন্য একটি নিবন্ধ হতে পারে) শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ হয় নি। বিদ্যালয়গুলো ধুঁকছে এবং চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে এই ধরনের কিছু শিক্ষিকার ছুটি বৃদ্ধি করা সেই ব্যাহত হওয়াকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এর সঙ্গে আরো একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, যেসব পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা শুধুমাত্র ৫ম থেকে ১২শ শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যে সব বিদ্যালয়ে ১, ২, ৩ বা ৪/৫জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন বা শুধু শিক্ষিকা রয়েছেন, যেখানে হয়তো দেখা যাবে কিছু বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকাই এই ছুটির আওতায় আসতে পারেন, সেখানে অতিরিক্ত ছুটি নেওয়ার কারণে সমগ্র বিদ্যালয়ের অস্তিত্বটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে যেতে পারে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধরনের কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্যও দেখা যেতে পারে, কারণ কোনো শিক্ষিকা না থাকলে যদি কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে সে ক্ষেত্রে তাঁর ছুটি পাওয়া প্রয়োজন অনুসারে সম্ভব নয়। অথচ যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা বেশি সেখানকার শিক্ষিকারা (যাঁরা এই ছুটি পাওয়ার যোগ্য) এই প্রকার ছুটি পেতেই পারেন। অর্থাৎ বৈষম্যের সূত্রপাত এখানেও

হতে পারে।

বিদ্যালয়ের সকল প্রকার ছুটির বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় এসেই পড়ে। বিদ্যালয়ে দু রকমের ছুটি থাকে — এক, সাধারণ ছুটি অর্থাৎ সমগ্র বিদ্যালয় যখন বন্ধ থাকে। দুই, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ছুটি। যেটা শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা ব্যক্তিগত স্তরে নিজের প্রয়োজন মতো নিতে পারেন, কিন্তু তখন বিদ্যালয়ের সাধারণ পঠনপাঠনের কাজকর্ম চলতে থাকে। প্রথম প্রকার ছুটির সংখ্যা বর্তমানে রবিবার বাদে ৬৫ দিন যেটা পূর্বে ছিল ৯০। কিন্তু সরকার পঠনপাঠনের কথা ভেবে সেই ছুটি কমিয়ে আনে। আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগত ছুটি আবার দুই প্রকার। একটি ক্যাজুয়াল লিভ (বছরে সর্বাধিক ১৪টি) ও অন্যটি মেডিক্যাল লিভ (বছরে সর্বাধিক ১৫ এবং সারা চাকরি জীবনে সর্বাধিক মোট ৩৬৫ দিন সবেতন)। এখানে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা থেকে বলতে পারি বিদ্যালয়ের সাধারণ ছুটি যদি কিছু বৃদ্ধি করা হত তাহলে পঠনপাঠনে খুব একটা সমস্যা হত না, বরং অশিক্ষক কর্মচারীদের অনিয়মিত হওয়ার প্রবণতা বাড়বে আর শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু সমগ্র বিদ্যালয়ে কিছুদিন ছুটি বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিজেদের প্রস্তুতির সময় বাড়বে— এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে বলে রাখা ভাল, সাম্প্রতিককালে শিক্ষিকাদের যে সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা দ্বিতীয় পর্যায়েই পড়ে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ছুটি এবং এর ফলে বিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবের কারণে।

শিক্ষিকাদের সন্তান প্রতিপালন ছুটির জন্য বিদ্যালয়ের ভালমন্দের বিষয়ে আরো কয়েকটি দিকে অবশ্যই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। যদি এটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতেই হয় আর সেই নিয়ে ছুটির অধিকারীরা ছুটির আবেদন না-ও করতে পারেন। এটা যেমন ঠিক তেমনি সকলে একসঙ্গে আবেদন করতে পারেন এটাও ঠিক। আমরা যে বাজার অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত আর্থসামাজিক পরিকাঠামোতে বসবাস করছি সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাটাই একমাত্র ও অন্যতম লক্ষ্য অধিকাংশের ক্ষেত্রে (কিছু ব্যতিক্রমী ছাড়া), সেখানে নানা কারণে দেখা যাবে যে একসঙ্গে অনেকে ছুটির জন্য আবেদন করছেন। যে সময় (মূলত মে থেকে সেপ্টেম্বর) বিদ্যালয়ে পাঠদানের কাজের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই সময় হয়ত ফাঁকির উদ্দেশ্যে এরকম ছুটি নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। আরো কিছু কারণে একসঙ্গে এই সন্তান প্রতিপালন করার ছুটি নেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। যদি সব মহিলার সন্তানের সমস্যা দেখা দেয়— যেমন একই সঙ্গে সন্তানদের পরীক্ষা থাকতেই পারে। এখানে সকল শিক্ষিকা বা অধিকাংশ শিক্ষিকার কথা বলা হচ্ছে যাঁদের অনুপস্থিতি বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে এবং স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যা দেখা দিতে পারে। এখানে কিছু ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি বিশ্লেষণ সবার সঙ্গে শেয়ার করা যেতে পারে। কয়েকটি বিদ্যালয়ের কিছু প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই ধরনের ছুটির ব্যাপারে। তাঁদের কথার রেশ ধরে বলা যায় যে, সমগ্র বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এই ধরনের ছুটির বর্তমান নিয়মকানুনের ফলে। উদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ভীষণভাবে আতঙ্কিত কীভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে অনেকের মত বিভিন্ন। যেমন কয়েকজনের বক্তব্য, যদি এরকম হয় সবাই যদি একসঙ্গে ছুটির জন্য আবেদন করেন তবে যাঁর বয়স বেশি বা যাঁদের আগে ছুটি না দিলে পরে এই ছুটি পাবেন না (কারণ তাঁদের সন্তানদের বয়স ১৮ বছর পেরিয়ে যেতে পারে) তাঁদের প্রথমে ছুটি মঞ্জুর করা হবে। যদিও এরকমভাবে ছুটি মঞ্জুর করার প্রথার কথা সরকারি নিয়মে উল্লেখ করা হয় নি। এটাও তৈরি করতে পারে বৈষম্য। যেমন যে নিয়মের ভিত্তিতে অর্থাৎ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ছুটি মঞ্জুর করা হল সেখানে দেখা যেতে পারে যাঁদের ছুটি মঞ্জুর করা হল না তাঁদের অধিক প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ যাঁদের ছুটি মঞ্জুর করা হল না তাঁর সন্তান অধিক অসুস্থ যাঁদের ছুটি মঞ্জুর করা হল তাঁদের থেকে। এই জায়গায় তৈরি হবে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, অভিমান, যার প্রভাব অবশ্যই পঠনপাঠনে পড়তে বাধ্য। কয়েকজন প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা তো বলেই ফেললেন যে, সংশ্লিষ্ট ছুটি পেতে গেলে আগে সন্তুষ্ট করতে হবে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিকে। এই সন্তুষ্টি আসবে যে ঠাকুর যে ফুলে সন্তুষ্ট হন সেটা দিয়েই। বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলা

হয়েছে যাঁরা নিজেরাই এই ছুটি পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের বক্তব্য হল বিদ্যালয়ের কী হবে জানি না, আমরা আগে ছুটি নিয়ে নেব। আবার এই ধরনের ছুটির ক্ষেত্রে যে শিক্ষিকাটি অনুপস্থিত থাকবেন তাঁর অনুপস্থিতির জন্য ফাঁকা যাওয়া শ্রেণীর ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষিকাই তাঁদের অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। কমপক্ষে তাঁরা আবেদন করবেন যাতে করে শিক্ষিকার উক্ত ছুটির অনুপস্থিতির কারণে প্রভিশনাল ক্লাস যেন তুলে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয় থেকে প্রভিশনাল ক্লাস তুলে দেওয়া হলে পার্শ্ববর্তী মূল শ্রেণীতে কোনোপ্রকার সাধারণ ক্লাশ নেওয়াই দুরূহ হয়ে উঠবে। মূল কথা হল এই ধরনের ছুটিকে নিয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা, সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি ও অভিভাবক অভিভাবিকার মধ্যে চূড়ান্ত টানাপোড়েন, গোলমাল, দুর্নীতি, মানসিক দ্বন্দ্ব, অভিমান এবং সর্বোপরি সম্পর্কের অবনতি হতে বাধ্য কারণ বৈষম্য উদ্রেককারী।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে এই ধরনের ছুটির অধিকারের ফলে এ রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে পঠনপাঠনে এবং স্বাভাবিক প্রশাসনে নেমে আসবে চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। এর মূল কারণ বিদ্যালয়ে কর্মচারীর অভাব। এমনিতেই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর সমস্যা। যেমন, বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল, বিভিন্ন সরকারি অনুদান প্রদান, ন্যূনতম শাস্তির অভাব, শিক্ষক শিক্ষিকার দীর্ঘসময় নিয়োগ না হওয়া বা হলেও সেখানে চূড়ান্ত অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। এই নতুন সন্তানসন্ততি প্রতিপালনের জন্য প্রদেয় ছুটি সেই সমস্যায় ঘৃতাহুতি দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। কেন এত কিছু জেনেও এমন ধরনের একটি নিয়ম সরকারি তরফে চালু করা হল বা এটা কি ঠিক যে সরকার এসব না জেনেই এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এই দুটো বিষয় এখানে খতিয়ে দেখা যাক। আমরা প্রথমেই ধরে নিচ্ছি যে সরকার এই ধরনের ফলাফল হতে পারে এটা না জেনেই সন্তান প্রতিপালন করার ছুটি বিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদন করেছে। সেটা যদি হয় তবে বলতে হবে চূড়ান্ত অপদার্থতা এবং অযোগ্যতাসম্পন্ন নীতি নির্ধারকের দ্বারা আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালিত। যার জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটাই একটা বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গেছে। সেইসঙ্গে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের অস্তিত্বটাই ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসবে। ঠিক যে কথা দিয়ে আমরা এই নিবন্ধ শুরু করি। গবেষণার প্রয়োজন নেই। একটু খতিয়ে দেখলেই বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্বের সঙ্কটের কারণগুলো চারপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের নীতিনির্ধারকের কাজকর্মের মধ্যেই। যাই হোক এবারে আমরা দ্বিতীয় কারণে আসি। সরকারি তরফে নীতিনির্ধারকেরা জেনে বুঝেই এই নিয়মটি করেছেন। এখানে সরকারি তরফে একটি প্রচ্ছন্ন বিষয় থেকে যায় যে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর অবলুপ্তিকে আরো ত্বরান্বিত করবে এই ধরনের সিদ্ধান্তই তাঁরা নিচ্ছেন। এখানে যে কারণ দুটি সামনে আসে তা হল একদিকে সরকারি খরচের বোঝা হালকা করা এবং অন্যটি ভোট বৈতরণী পার হওয়া। ভারতের অন্য যে কোনো রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বাধিক ; সমস্ত কর্মচারীদের সবরকম মাসোহারার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে ন্যস্ত। বিগত কয়েক বছরের সরকারি কিছু সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকার এখন আর এইসব বিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থব্যয় কমাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেজন্য বিভিন্ন উপায়ে এর অস্তিত্বটাই ধীরে ধীরে লোপ পাওয়াতেও ব্যস্ত। সেখানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেখানে পঠনপাঠনের অবস্থাটা ভেঙে পড়ে বিদ্যালয়গুলো শুধু সরকারি অনুদান (সাইকেল, কন্যাশ্রী ইত্যাদি) প্রদানের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এর ফলে এইসব বিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠবে সেইসব মানুষদের জন্য যাদের কাছে পঠনপাঠনের গুণগত মানের চাইতে সরকারি আর্থিক অনুদানটাই বড় হয়ে উঠবে। এর ফলে সমাজের বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন ধীরে ধীরে নিজের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে চলে যাবে বেসরকারি বিদ্যালয়ে। এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এখনো পর্যন্ত এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই এই ধরনের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ওপরই নির্ভরশীল। এভাবেই আগামী বছরের আসন্ন বিধানসভার ভোট হয়ে উঠবে সরকারি দলের কাছে হাতের মোয়া। আরো একটিভাবে সরকার সন্তানসন্ততি প্রতিপালনের

ছুটির মাধ্যমে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা হল সমগ্র শিক্ষক শিক্ষিকা সমাজের মধ্যে বিভাজনের রাস্তা তৈরির দ্বারা। বিগত কয়েক বছর ধরে সমগ্র সরকারি কর্মচারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সরকার নিরুত্তর। এছাড়াও সরকারের ওপর আরো বিভিন্ন ধরনের আর্থিক দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মচারিরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায় সামনের ভোট বৈতরণী পার করতে সরকার নেমেছে বিভাজনের রাজনীতিতে। বিদ্যালয়ের কর্মচারিদের একটি অংশকে (মহিলারা যাঁদের ১৮ বছরের কমবয়সী সন্তান রয়েছে) বিশেষ কিছু সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মন জয়ের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শিকেয় উঠলেও সরকার ভাবলেশহীন। এই সন্তান প্রতিপালনের ছুটির দ্বারা শুধুমাত্র সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিকারাই নয় তাঁদের স্বামী শিক্ষক (কারো কারো) এবং পরিবারকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে অধিকাংশ বিদ্যালয় কর্মচারিগণ অনেকটাই সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল সেটা এই সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিভাজনের দ্বারা একটা বৃহৎ অংশ সরকারি পক্ষে চলে আসবে বলেই মনে হয়।

নিজের সন্তানের জন্য বুকের দুধ আর বিদ্যালয়ের অন্যান্য সন্তানসন্ততিদের জন্য রইল পিটুলিগোলা জল। সামগ্রিকভাবে এই হল সন্তানসন্ততি প্রতিপালন ছুটির নির্যাস। যে নির্যাস বের করার অধিকার শিক্ষিকারা পেলেন সরকারি নিয়মের ফলেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, সন্তানের কাছে তার মায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু একই সাথে একজন ছাত্রছাত্রীর কাছে তার নিজস্ব শ্রেণীর শিক্ষিকার গুরুত্বও কম নয়। সমগ্র বিদ্যালয়ে একজন স্থায়ী শিক্ষিকার শ্রেণীর বহু ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠনের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলা যায়। সেই মেরুদণ্ডের ধারাবাহিক অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিতে বাধ্য ছাত্রছাত্রীকুলের ভবিষ্যৎকে। এমনিতেই শিক্ষিকারা সন্তান জন্মের জন্য অধিকারস্বরূপ ৬ মাসের সবেতন ছুটি পেয়ে থাকেন। দু'জন সন্তানের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি হবে মোট ১ বছর। অর্থাৎ বর্তমানে একজন শিক্ষিকা সমগ্র চাকরি জীবনে (সর্বাধিক) মোট ৪ বছর (যার মধ্যে ১ বছর মাতৃত্বকালীন ছুটি, ২ বছর সন্তান প্রতিপালন ছুটি এবং ১ বছর সাধারণ অসুস্থতাজনিত) ছুটি পাওয়ার অধিকারী হবেন যদি তাঁরা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেন। এছাড়া সকলের মতো শিক্ষিকাদের প্রতি বছর ১৪টি ক্যাজুয়েল লিভ তো আছেই। তবে মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে উক্ত স্থানে সরকারি নিয়মের পরিবর্তে শিক্ষক/শিক্ষিকা নেওয়া যায়, কিন্তু সন্তান প্রতিপালন ছুটির ক্ষেত্রে উক্ত স্থানে কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকা নেওয়ার নিয়ম নেই। হয়তো সেটা সম্ভবও নয়। কারণ সন্তান প্রতিপালন করার ছুটির কোনো নির্দিষ্টতা নেই। সেটা শিক্ষিকারা সারাজীবনে দফায় দফায় যে কোনো সময়ে নিজের মর্জি মাফিক নিতে পারেন। ফলে প্রশাসনিকভাবে উক্ত অনির্দিষ্ট ছুটির জন্য পরিপূরক শিক্ষক/শিক্ষিকা নেওয়া সম্ভবও নয়। সেটা করার জন্য সরকারও খুব একটা ইচ্ছুক হবে বলে মনে হয় না। কারণ একই সময়ে একই পদের জন্য দুজনকে মাসোহারা গুনতে হবে সরকারকে। যেটা করতে সরকার মোটেও প্রস্তুত বলে মনে হয় না। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণের বা কন্যাশ্রী প্রকল্পের বা মিড ডে মিলের বা এই জাতীয় কোনো বস্তুগত কিছু পাইয়ে দেওয়া। বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের গুণগত মানের উন্নয়নের সঙ্গে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার সম্পর্ক অল্পই।

সর্বশেষে একান্ত ব্যক্তিগত দু'একটি কথা বলা যাক। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোকে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত সমস্যার। এমতাবস্থায় নীতিনির্ধারকদের আরো অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে বিদ্যালয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুন তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে করে উক্ত বিদ্যালয়গুলোকেও সাধারণের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়। এটা না করে নিয়মনীতিগুলো যদি এরকম হয় যে তার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তবে সেটা হবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর দৃষ্টিভঙ্গীতে আত্মহত্যার সামিল। এই সন্তানসন্ততি প্রতিপালনের জন্য ছুটির ব্যবস্থা প্রকারান্তরে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্বের বিলোপসাধন ত্বরান্বিত করবে সন্দেহ নেই।

উমা

কার লাভের গুড় কে খায়!

বরুণ ভট্টাচার্য

একদিন এক মেধাবী ছাত্র সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমি অনেকদিন ধরে আপনার কাছে কত কি শিখলাম, জানলাম, আমার মনের জানলা খুলে গেল। কিন্তু কই আপনি আমাকে জীবনে সফল হতে গেলে কী করতে হবে, তা তো শেখালেন না?' সক্রেটিস ছাত্রের প্রশ্ন শুনে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'চলো, কাছেপিঠে একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক, দেখি সেখানে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি কি না।' দুজনে নদীর ধারে এলেন। এবার সক্রেটিস ছাত্রটিকে বললেন, 'তুমি নদীর একদম কিনারায় দাঁড়িয়ে নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকো।' শিক্ষকের কথামতো ছাত্র যেই ঘাড় হেঁট করে নদীর দিকে তাকিয়েছে, অমনি সক্রেটিস ছাত্রের মাথাটা জোর করে জলের ভেতরে চুবিয়ে ধরলেন। ছাত্রটি দম নেবার জন্য ছটফট করতে লাগল, সক্রেটিস কিন্তু কিছুতেই চাপ আলগা করলেন না। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর ছাত্রটি মরিয়া হয়ে এক ঝটকায় সক্রেটিসের হাত থেকে মাথাটা ছাড়িয়ে নিল। সক্রেটিসের এহেন আচরণে সে বেশ বিস্মিত। ভাবল, নিশ্চয়ই তার শিক্ষকমশাইয়ের মাথাটা গেছে, নয় তো ওঁর মতো মানুষ অমন করে! ছাত্রটি সে কথা সক্রেটিসকে বলেও ফেলল। সক্রেটিস তো তৈরিই ছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, জলের মধ্যে তোমার মাথাটা যখন ডোবান ছিল, তখন তুমি ঠিক কী ভাবছিলে?' ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আপনার হাত থেকে মাথাটা ছাড়িয়ে কীভাবে দম নেব, ওই সময় এটা ছাড়া অন্য কিছু তো ভাবতেই পারি নি।' এইবার সক্রেটিস ছাত্রটিকে বললেন, 'এসো তোমার প্রশ্নের উত্তরটা জলের মতো বুঝিয়ে দিই। জানো সাফল্যের রাস্তাটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করলেই তা পাওয়া যায়— মাথা জলে ডোবা অবস্থায় তুমি যেমনটি ভেবেছিলে ঠিক তেমনি।' এ তো গেল দার্শনিকের গূঢ় ব্যাখ্যা। পথেঘাটে হরবখত রিকশা বা গাড়ির পেছনে নানান 'বাণী' লেখা থাকে। অধিকাংশই ভুলভাল বানানে। 'মেহনৎ করো, মালিক দ্যেগা', 'আমার ঘাম তোমার পয়সা' – এমন সব বিচিত্র কথা! এসব কথাও এখন কেউ বড় একটা কান দেয় না। আমাদের কাছে সাফল্যের রাস্তা দেখানোর রোল মডেল— বড় খেলোয়াড়, অভিনেতা ছাড়াও আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রী, পরবর্তী পর্যায়ে কোটি টাকার চাকরি পাওয়া আইআইএম/ আইআইটি-র সফল ছাত্রছাত্রীরা। সামান্য বোর্ডের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান পাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের মুখে মা-বাবার রসগোল্লা সন্দেশ ঠুসে দেওয়ার ছবি দেখে নিজের সন্তানদের যেন এমন রেজাল্ট হয়, ভেবে ভেবে বহু মা-বাবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কেন না লেখাপড়ায় ভাল হলেই সাত খুন মাফ! এই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সংযোজন সুন্দর পিচাই (আসল নাম পি সুন্দররাজ)। কে এই পিচাই? খড়্গপুর আইআইটি-র টপার, মানে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী। আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে গুগল-এ যোগদান, ধাপে ধাপে উন্নতি এবং শীর্ষপদ লাভ। অধুনা আমেরিকার নাগরিক। তার মেধার পুরোটাই গুগল-এর সম্পত্তি। আমরা জানি, আইআইটি-র মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি অনুদানে চলে। আর সরকার সে টাকা পায় করদাতাদের থেকে। রিকশাওয়ালা থেকে ঝুনঝুনওয়ালা- সবাই কমবেশি সরকারকে কর দেয়। ফাঁকিও দেয়। সুন্দর পিচাইরা সরকারি অনুদানের বেনিফিসিয়ারি। কিন্তু দেশ কি পেল? লবডঙ্কা! কিন্তু সেই সুন্দর পিচাই খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে গেল। একটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়তে লেখা হল বিশ্বায়ন ও সুন্দরের সাফল্য পরিপূরক! খড়্গপুরের অধ্যাপকেরা টিভিতে বাইট দিলেন, 'ও যে লম্বা রেসের ঘোড়া, তা গোড়াতেই বোঝা গিয়েছিল।' সহপাঠীরা বলল, 'সুন্দর তো ছুপা রুস্তম।' আমরা খবরটা গিললাম। ভারতীয় হিসেবে গর্বে বুক ফুলে উঠল। মধ্যবিত্তর স্বপ্নের পালে হাওয়া লেগে পতপত করে উড়তে লাগল। এভাবেই 'সুন্দর' ব্র্যান্ড চালু হয়ে গেল। একবার ভেবেও দেখলাম না আখেরে কার লাভ হল। আমার ঠাকুরমা বলতেন, 'পোঁটা চুনীর ব্যাটা চন্দনবিলাস', আর আমাদের প্রিয় কবি ও গায়কের হা-হুতাশ— 'টাকা, টাকা আর টাকা, সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা ...'

চাকদহে দান করে বাঁচান হল জলাভূমি

পুরনো দিনে রাজারা অথবা জমিদারেরা একদিতে যেমন প্রজাদের ওপর শোষণ চালাতেন, তেমনি অনেক ভাল কাজও করতেন। তারই একটি হল জল পানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাঁরা পুকুর কাটিয়ে দিতেন, ইদারা করে দিতেন, জলছত্র খুলতেন। আমাদের জল খাওয়ার বা পানীয় জলের মূল উৎস ছিল ছিল জলাশয়। বর্তমানে নাগরিক সভ্যতায় জলাশয় আর পানীয় জলের উৎস নয়— এখন বোতল সংস্কৃতি। জল এখন পণ্য, তাই শহরের বর্তমান জমিদারেরা শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জলাশয় নিশ্চিহ্ন করতে দল বেঁধে নেমে পড়েছে। জমিদারদের নতুন নাম প্রোমোটার অথবা ডেভেলপার। কেউ বলে থাকেন 'জমি হাঙর'। তাই শহরে জলাশয়ের থেকে জমির দাম অনেক বেশি। অতএব প্রথম ধাপে তা বুজিয়ে মাঠ করে ফেল, কোথাও কৃষিজমি দেখাও, তারপর তৈরি হবে মাল্টিপ্লেক্স। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।

কিন্তু চাকদহ শহরে হঠাৎ এমন কী হল, মাননীয় শিক্ষক খগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সাড়ে সাত বিঘের পুকুরটি দান করে বসলেন চাকদহ পৌরসভাকে? আসলে এই জলাশয়টি বোজানোর বহুদিন ধরে পরিকল্পনা চলছিল ভূ-মাফিয়াদের। তারা চেষ্টা করছিল এই জলাশয়ের পাড়ে মাটি ফেলে এবং পাড় বাঁধিয়ে তাকে ভরাট করবার। সমস্ত পুকুরটি ভরাট করলে প্রায় ১০ কোটির বেশি টাকার কাজ। তাই চাপ সৃষ্টি করা শুরু হল খগেনবাবুর ওপর, যা প্রোমোটার বা ডেভেলপাররা করে থাকেন। আপনি বাড়ি শুদ্ধু বেচে দিয়ে কল্যাণী চলে যান, সেখানে আরামে থাকবেন, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রাখবেন। কিন্তু খগেনবাবুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কিছু জলাভূমি বাঁচানো মানুষদের, যাঁরা নিভৃতে কাজ করে চলেন। তাঁরা খগেনবাবুকে বোঝালেন, তুমি চাকদহে এতদিন বসবাস করছ, চাকদহে তোমায় সবাই চেনে, বহুদিন তুমি শিক্ষকতা করেছ, তা ছেড়ে তুমি চলে যাবে কেন? বরং তুমি পুরসভাকে এই জলাভূমি দান করে দাও। তাহলে তুমি সারাজীবন চাকদহে মহান ব্যক্তি হয়ে থাকবে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। গত ৫ আগস্ট সাড় সাত বিঘের জলাশয় দান করলেন খগেনবাবু পুরসভাকে। এই দানপত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, এটি জলাভূমিই থাকবে যে দলেরই পৌরসভা হোক না কেন। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও চাকদহের আপামর মানুষ সাক্ষী থাকল। সমস্ত বড় কাগজে যখন জলাশয় বন্ধ হওয়ার খবর বড় বড় করে ছাপা হয় তখন এ ধরনের ব্যতিক্রমী প্রয়াসের খবর নেই। জলাভূমি রক্ষার যে আন্দোলন চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার বন্ধুরা চাকদহের আপামর মানুষকে নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে, তা সত্যি উদ্বুদ্ধ হওয়ার। খগেনবাবু আপনাকে আমাদের সেলাম।

বিবর্তন ভট্টাচার্য

বইমেলায় উৎস মানুষ

যথারীতি এবারও বইমেলায় থাকছে
উৎস মানুষ। প্রকাশিত হচ্ছে
ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের
চারপাশের পরিবেশ বিষয়ক বই
'গুমোট ভাঙার গান'

নবকলেবরে
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান

'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' অনেক দিন
নিঃশেষিত। দুই খণ্ডের
'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান'
পরিমার্জিত হয়ে একখণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে

প্রয়াত মাখনী বিশ্বাস স্মৃতিচারণ সভা

গত ২৮ মার্চ, শনিবার আমাদের বাড়িতে প্রয়াত ঠাকুরমা মাখনী বিশ্বাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে একটি স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা আমার বাবা জীবন বিশ্বাস মহাশয়। আমাদের বাড়িতে কোনো মৃতজনের প্রতি স্মৃতিচারণার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন অতীতে কোনোদিন হয়েছে বলে শুনি নি। তাই আমি নিজেও অনুষ্ঠানটা কেমন হয় তা দেখার জন্য শুরু থেকেই আগ্রহী ছিলাম।

বিকেল চারটে নাগাদ সভা শুরু হয়। আমার বাবার অনুরোধে শিক্ষক সঞ্জয় ঘোষ মহাশয় সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের বিনম্র নির্দেশে সকলে ঠাকুরমার প্রতিকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্ব শুরু হয়। প্রথমে মালা দেন বাবা। এরপর উপস্থিত প্রায় সকলেই মাল্য বা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর স্মৃতিচারণ শুরু। স্মৃতিচারণ শুরু করে বাবা বলেন, 'বছরদুয়েক আগে আমার ঠাকুরমার মরণোত্তর কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য আগরতলা থেকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হরিণঘাটা এলাকায় আমার কাকুর বাড়ি যাই। গিয়ে কাকুদের পরনে স্বাভাবিক পোশাক পরিচ্ছদ, স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া (স্মৃতিচারণ সভার আগে পর্যন্ত নিরামিষ খেয়েছেন) দেখে কিছুটা অবাকই হলাম। আরো শুনলাম পিণ্ডদান করেন নি, মুখাগ্নি করেন নি। পিণ্ডদান, মুখাগ্নি ছাড়াই হালিসহর ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঠাকুরমাকে দাহ করা হয়েছে। ঠাকুরমার স্মৃতিচারণ সভায় পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য মৃতদেহের সৎকার এবং মৃত ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন কোনোটাই আমার কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হল না। তাই আমার মায়ের কাজটাও ঠাকুরমার মরণোত্তর কাজের মতোই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আমার পরিবারের সকলের কাছেই আমি আবেদন রেখেছি সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমার মায়ের মরণোত্তর কাজ করুক, তাতে আমার ষোল আনা সহযোগিতা থাকবে, বিন্দুমাত্র বিরোধিতা থাকবে না। তবে তাদের কাছে আমার অনুরোধ এইটুকু যে, আমার মায়ের কাজটি যেন আমার যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী করতে সহযোগিতা করা হয়। এই নতুন পদ্ধতিতে মায়ের মরণোত্তর কাজ করতে গিয়ে কোথাও যদি ভুল করে থাকি তবে তা সংশোধন করে দেবেন বলে সকলের কাছে আশা রাখি।'

ঠাকুমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাবা বলেন ঠাকুরমা একদম আলসে বসে থাকতে পারতেন না। বয়স আশির উপরে হলেও সারাক্ষণ টুকটুক করে কাজ করে চলতেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও বঁটি নিয়ে তরিতরকারি কাটতে বসা দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। বার্ধক্য হেতু মাঝে মাঝে তরকারি কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলতেন। এ অবস্থায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাটা জায়গাটি চেপে ধরে উঠে যেতেন। পরের দিন আবার বঁটি নিয়ে বসতেন। এই ছিলেন আমার মা, বললেন বাবা।

বাবার পর স্মৃতিচারণ করেন হরিণঘাটা থেকে আসা আমার ঠাকুরদা নিরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়। তিনি প্রয়াত ঠাকুরমা ও উপস্থিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন 'প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৬৬ সালে আমার বাবা মারা যান। তখন আমি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত। আমার বয়স তখন ২৫ বছর। ভাইবোনেদের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে বাবার মুখে পিণ্ডদান, মুখাগ্নি করে শবদেহে অগ্নিসংযোগ করি। শবদাহের পর ধরা-কাছা নেওয়া থেকে শ্রাদ্ধাদি পর্যন্ত সবই বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করি। এরপর ১৯৮০ সাল নাগাদ উৎস মানুষ নামে একটি বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা আমাদের হাতে আসে। পত্রিকাটির মূল বিষয়বস্তু হল, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কোনো কিছুই কার্য-কারণ ছাড়া ঘটে না। এই সহজ সত্যটিকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা। জন্ম ও মৃত্যুও তার বাইরে নয়। আমার জন্মের পর যে মা ও বাবা আমায় কোলে করে আদর করেছেন, চুমু খেয়েছেন তাঁদের মৃত্যুর পর সন্তান হয়ে তাঁদের চিতায় তুলে আমার হাতেই প্রথম তাঁদের মুখে আগুন দেওয়া, এটা চূড়ান্ত অযৌক্তিক ও

নিষ্ঠুরতার প্রতীক। অথচ যুগ যুগ ধরে এই নিষ্ঠুর ক্রিয়াকর্মটি চলে আসছে। এখনও চলছে। বাবার মৃত্যুর পর এই অন্যায় অমানুষিক কাজটি করে থাকলেও মায়ের মৃত্যুর পর করি নি। হালিসহর শ্মশানঘাটে বিদ্যুৎচুল্লিতে মুখাগ্নি ছাড়াই শবদাহ করা হয়েছে। তারপর একদিন পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জীবন ওর মায়ের মরণোত্তর কাজটি অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছে। ওর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখে খুব ভাল লাগল। আগামী দিনে এই যুক্তিনির্ভর কাজ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা রেখে ঠাকুরদা তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

উপস্থিত অভ্যাগতগণের পক্ষ থেকে এই মানবিক ও যুক্তিবাদী উদ্যোগের পক্ষে বক্তব্য পেশ করা হয়।

সবশেষে সভাপতি মহাশয় এই স্মৃতিচারণ সভার উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান। উদ্যোক্তা জীবন বিশ্বাস এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক: ঝুলন ভৌমিক (বিশ্বাস)
আগরতলা

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

আপনার পাঠানো 'উৎস মানুষ' পত্রিকা ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫) এবং ২য় সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৫) আন্তরিকতা সহ পেয়েছি। সমকালীন সময়ের উপযোগী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন লেখনী আমাদের আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং আগামীতে করবে বলে আমরা বিশ্বাসী। পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। ভালো থাকুন... সুস্থ থাকুন... সকলকে ভাল রাখুন এই কামনায়

শ্রদ্ধা ও ভালবাসাসহ
রাজা রাউত

সেক্রেটারি,
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব

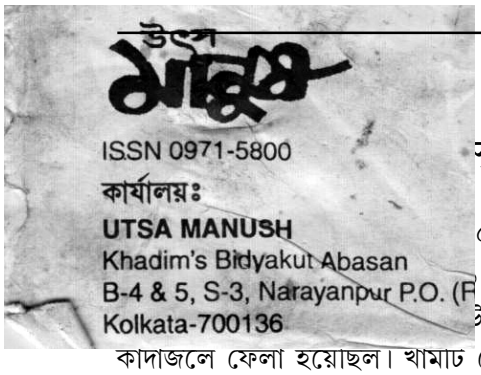

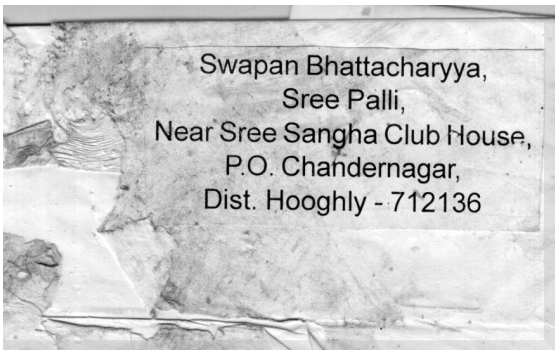

স্থা !

৫ সংখ্যাটি যে ভাবে
৫ তারিখে) আঁতকে
ট খুবলে ছিল, পরে
কাদাজলে ফেলা হয়োছল। খামাট যেমন পেয়েছি সে অবস্থায় এই চিঠির সাথে পাঠালাম। পোস্টমাস্টার জেনারেলকে (পশ্চিমবঙ্গ) একটি দিলাম, কারণ আমার কাছে ডাকযোগে যে সব পত্রপত্রিকা আসে সে সম্পর্কে স্থানীয় ডাক-কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করে সুফল মেলে নি। আমার খামটি নিয়ে যদি আপনাদের ডাক-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে ভাল হয়। এঁরা হয়ত সতর্ক হতে পারেন।

স্বপন ভট্টাচার্য
শ্রীপল্লী, চন্দননগর, ৭১২১৩৬

উৎস মানুষ
WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৫ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ ২০টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ইউ বি আই-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন ইউ বি আই কলেজ স্ট্রিট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India
College Street Branch, Kolkata- 700073
UTSA MANUSH
SB ACCOUNT NO. 0083010748838
IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুন্ডু
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
(কলেজ স্ট্রিট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং- ৯৮৩০২ ৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান (সংকলন)	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৩৫.০০
লেখালিখি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি (সংকলন)	৪০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোজ (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোজ, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইন্সট্যান্ট ডায়গনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রিবাড়ি রোড। পো.অ. - চৌমাথা। আগরতলা-৭৯৯০০১। (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭। ডাঃ শান্তিরঞ্জন মল্লিকের চেম্বার– কোন্নগর।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ